বাতায়ন

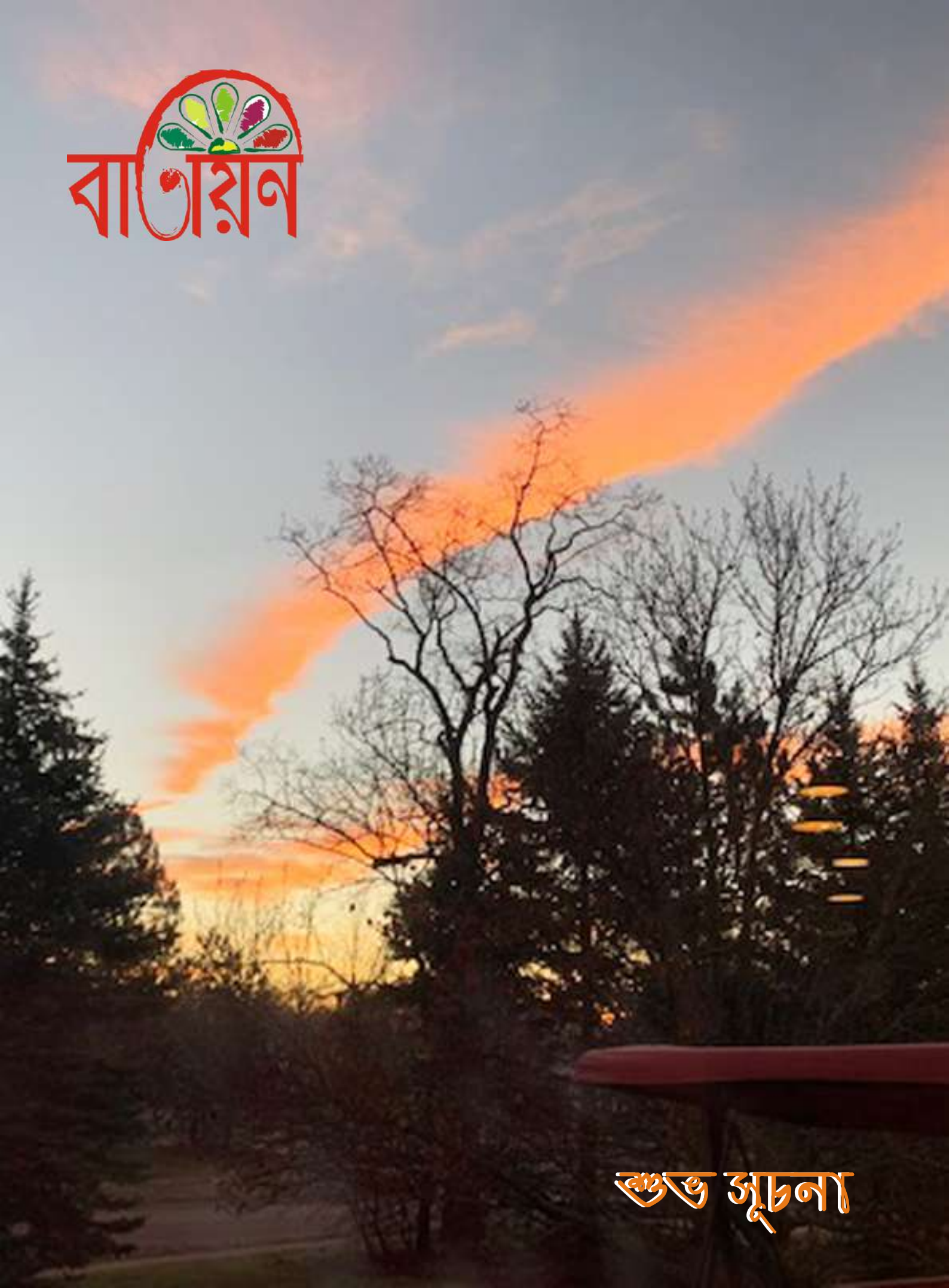

শুভ সূচনা

নিরালায় এক মনে

সম্পাদিকা
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Volume 27 | January, 2022

A literary magazine with an International reach

বাতায়ন

Issue Number 27 : January, 2022

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Front Cover

Tanima Basu **আগুনের পরশ মিহি বাতাশে – মিশিগানে ভোরের আকাশ**

তনিমা পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

Front Inside Cover

নিরালায় এক মনে – Kings Park, Perth

Back Cover

Tirthankar Banerjee **Cascades, Pemberton, WA**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি মরক্কো ঘুরে এসেছেন আমার এক পরিচিত । সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার একদিন আগে ফিরে এসেছেন আমেরিকায় । তাঁর মুখে শুনলাম ওমিক্রনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সীমানারুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ভারী তৎপরতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাঁর পর্যটন কোম্পানী । করোনা অতিমারীর কবলমুক্ত হয়নি এখনো আমাদের বাসগৃহ পৃথিবী । কিন্তু বিশ্ববাসী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । হার না মানার এই মনোভাব আমাদের প্রাণে সঞ্চার করে আশা । আস্থা ফিরে আসে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ধনাত্বক তার প্রতি ।

২০২১ বিদায় নিতে বেশী দেরী নেই । কোন একটি বছরকে আমরা যখন বিদায় জানাই, স্বাগত জানাই আর একটি বছর । ফেলে আসা বছরে থেমে থাকেনি 'বাতায়ন' পত্রিকা । অনেক নতুন বন্ধুকে চলার পথে সামিল করে নিয়েছে বাতায়ন পরিবার । সিডনি, শিকাগো, কলকাতা, হিউস্টন, ভিয়েনা – সামাজিক দূরত্বের সময়েও ভাবনা ও অনুভূতির বিনিময় হয়ে চলেছে বাতায়নের আঙ্গিনায় । পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতা বিনিময়ের এই প্রতিশ্রুতিটুকু যে 'বাতায়ন' পালন করে চলেছে তার জন্য বহুজনের সহযোগিতা প্রয়োজন । যাঁদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব আমরা পেয়েছি তাঁদের সকলকে পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা । আশা করি আগামী বছরেও পাশে থাকবেন তাঁরা । বাতায়ন পরিবার সমৃদ্ধতর হবে, সৃষ্টিশীলতার এই মেলবন্ধন হবে দৃঢ়তর ।

শুভ হোক ২০২২ ।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
'বাতায়ন' গোষ্ঠী সম্পাদক
শিকাগো, ইলিনয়

সূচীপত্র বাতায়ন

কবিতা

শুভ্র দাস

নাড়ির টান 7

উদ্দালক ভরদ্বাজ

একদিন 8

কান্না 8

মানস ঘোষ

জল রঙ 9

ধীমান চক্রবর্তী

ছোট-বড় 10

শঙ্খ ভৌমিক

দুটি কবিতা 11

আনন্দ সেন

আসছে সে দিন 12

শ্রাবনী রায় আকিলা

আপনার আজকের দিনটি 13

সৌমিত্র চক্রবর্তী

এখন, এ' সময়ে 13

বাসবী খাঁ ব্যানার্জী

চলে তো যাওয়াই যায় 14

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায় 15

ইন্দিরা চন্দ

অমোঘ 16

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল 17

Debasish Gooptu

তোমাকে ভালবেসে 18

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্যামল দাশগুপ্ত

শংকর – বাংলা সাহিত্যের উপেক্ষিত নায়ক 20

সূচীপত্র বাতায়ন

গল্প

রমা জোয়ারদার

নজর 24

সুজয় দত্ত

সমাধান 26

স্নিগ্ধা সেন

বাণপ্রস্থ 34

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

পাঁউরুটির গন্ধ 43

নন্দিনী ব্যানার্জী

চরৈবতী 50

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

স্নিকার ... 52

নাটক

সমাদৃত চক্রবর্তী

দরজার আড়ালে 54

অন্য স্বাদের লেখা

উদয় মুখার্জী

কিছু অল্পজানা তথ্যের খোঁজে 57

মিতালি রায়

উলকি 59

ভ্রমণ

সৌমিত্র চক্রবর্তী

বড়ন্তি বেড়ানো 65

চিত্রাঙ্কন

পার্থ প্রতিম ঘোষ

"কলকাতা" ... তুমিও হেঁটে দেখ কলকাতা ... যাবে কি আমার সাথে ... 6,19,23,64

My humble tribute to our beloved kolkata in watercolour on paper.

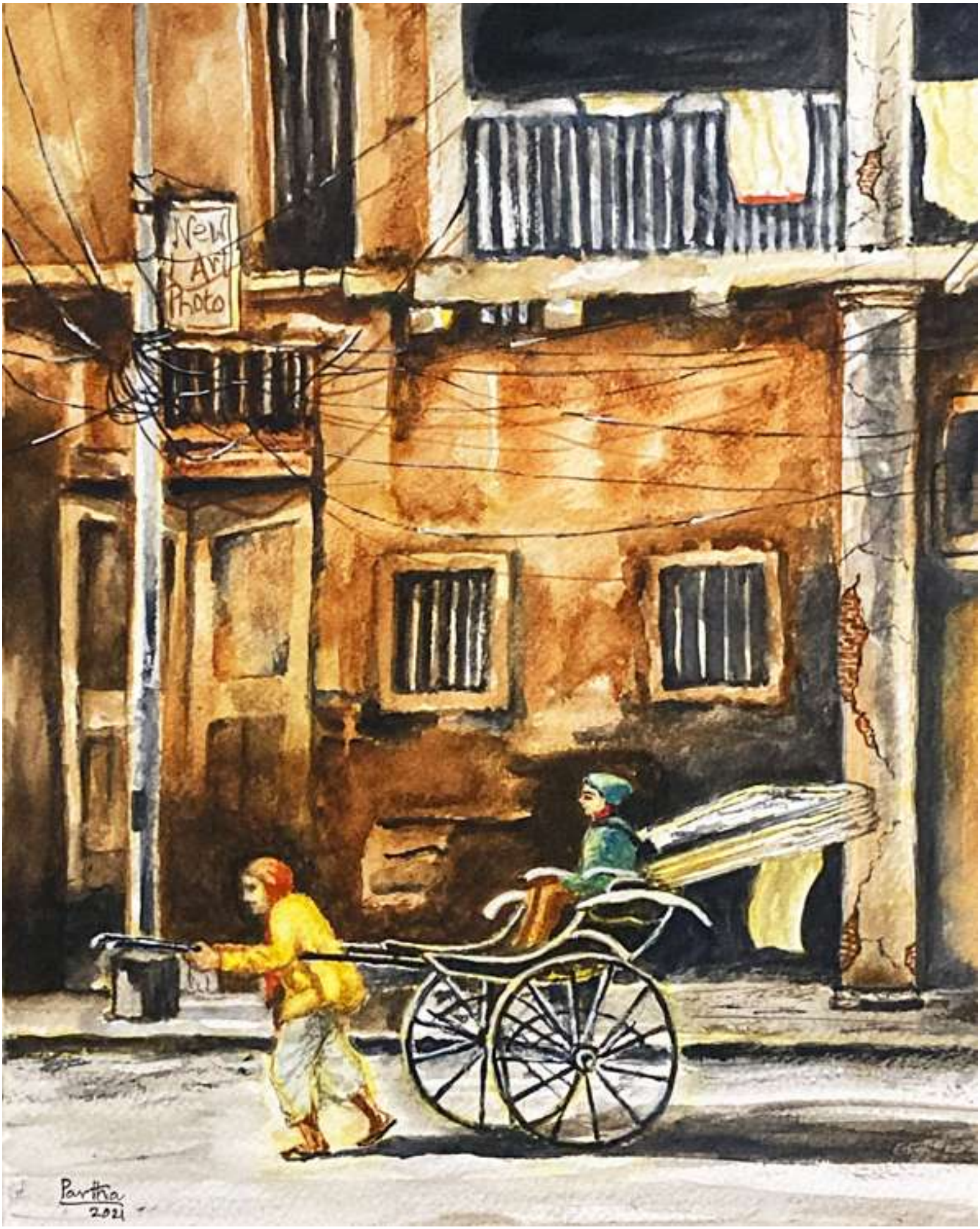

"Kolkata" ... tumio hete dekho Kolkata ... jabe ki aamar sathe ...
My humble tribute to our beloved kolkata
In watercolour on paper

শুভ্র দাস

নাড়ির টান

স্টেশনে ঢোকার সময় যখন
ট্রেনের গতি হয়ে যেতো মন্থর
পৃথিবীর দীর্ঘতম প্লাটফর্মটা ছুট্টে এসে,
ফিসফিসিয়ে উঠতো –
"নেমে আয়, নেমে আয়, কাছে আয়।"
বার বার ফোটানো দুধ-চা,
আর পুরনো তেলে ভাজা, লুচির গন্ধ
চেনা গলির আরাম হয়ে ম ম করতো সত্তায়;
তখন দূর থেকে প্রগাঢ় ভালোবাসায়
কুর্নিশ করেছি উঁচু টাওয়ারটাকে।

আমাদের ঘরবাড়ি –
সেখানে চলেছিল একসাথে বাঁচার মহড়া।
জন্মস্থান নয়, শুধু পুনর্জন্ম,
তবু নাড়ি বাঁধা।
ঝিম ধরা দুপুরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে
কুলফি, শিকানজি, আর ব্রেডভুজিয়ার
ভাগাভাগি, ছেদিলালের ঝুপড়িতে;
আর নক্ষত্রের রাতে গভীর অন্ধকার শেষে
দিগন্তে প্রথম ঊষার দর্শন।
এক সাথে ঢেউ তুলে মুকুটমণিপুর, কিংবা
দিঘার ঢেউয়ে ঝুলন-পূর্ণিমায় রাত্রিস্নান।
নাটকে, এক সাথে স্টেজ রাইট, স্টেজ লেফট;
ভাতঘুম, ক্লাশের পেছনের সারিতে।
সি-ব্লকের মাঠে আনাড়ি খেলাধুলো,
স্পেশাল ডিনারের লাইনে
মুরগির ঠ্যাঙের আশায় রসালাপ।
চায়ের টেবিলে মুহুর্মুহ তুফান তুলে
সিগেরেটের শেষ ছাই, পাঁচিলের কিনারে।
পিঠোপিঠি, পা-ঝুলিয়ে, কার্নিশের ধারের জটলা, যা
সেই কবে শেষ হয়েও থেকে গেছে বাকি;
আরও কত কত বুনেছি জাল, একসাথে,
অনন্ত ইতিকথার।

তারপর, একদিন দুম করে ফেটে পড়া
বোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো
ছিটকে গেছি সব, পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে।
বদলে গেছে পরিচিতি, বদলেছে ঘরবাড়ি।
অতীতের ঠিকানাগুলো শুধু
এক একটা স্বপ্ন হয়ে ভেসে আছে সত্তায়:
অ-১২৭, ঈ-২০২, উ-৩১২, ই-৩১৯;
অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা অতিক্রান্ত স্মৃতির সংখ্যা-মালা।
আর আজন্ম,
ভাই বোনেদের মতো সেই সুতোর মালায়
বাঁধা হয়ে গেছে আমাদের নাড়ি, যা বার বার
হাতছানি দেয়: "আয়, ফিরে আয়, কাছে আয়।"
আমরা কেবলই হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চেষ্টা করি একে অপরকে ।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

একদিন

তারপর, দৌড়তে দৌড়তে, একদিন
হেমন্তের কিনারায়, তার সাথে দেখা।
অথবা দেখা নয়, পরিচয় শুধু ...

বিবর্ণ ছায়া-মাখা ঘোলাটে শহুরে সন্ধ্যায়
যেমন হঠাৎ বৃষ্টি, ছড়িয়ে দেয় সোঁদাগন্ধ,
যেমন তির্যক মেঘের ফাটলে
লেগে থাকা শেষ রশ্মিরেখা,
তেমনি অনৃত সেই রূপ, অনন্য মাধুরী
ছড়াল কৈশোর রাগে একদিন
আমারও চঞ্চল মনে।

তারপর কি হল, আমিও জানি না,
সেও না।

কান্না

কান্না হল পাখির মত,
কখন আসে, কখন যায়।
বুকের ঘরে যে সুখ থাকে
তারই সঙ্গে সই পাতায়।

কান্না হল ফুলের মত,
অল্পতেই মূর্ছা যায়।
নয়ন ভ'রে সাগর জলে –
সুখের বালি ছড়িয়ে যায়।

দুঃখ সুখের ছন্দে গাঁথা –
এই জীবনের মুক্তোমালা –
তোমার চোখের ভাষায় এ মন
এ সব-কিছু দেখতে পায়।

কান্না তোমার চোখের মত,
যখনই সুখ হারিয়ে যায় –
দূরের থেকে অলীক প্রেমে
আমার বুকে হাত বুলায়।

মানস ঘোষ

জল রঙ

আগেই বারণ করেছিলাম, জলরঙ দিয়ে সমুদ্র এঁকোনা,
শুনলে না ।
বুঝি, অচেনা ছিল এই অসহমান শৈত্যপ্রবাহ, তাই...

সব জল জমাট বাঁধে, পুরু হতে থাকে হিমবাহের স্তর,
বরফ, সুশীতল।
পড়ে থাকে রঙের চূর্ণিত অবশেষ,

শুকনো রঙ ঝরে ঝরে পড়ে মেঝের ওপর,
বসন্তের নিঃস্ব পলাশের মতো, জড়ো হয়
তোমার অভাবী শৈশবের বর্ণহীন তটে..
পরিত্যক্ত ক্যানভাসে লেগে থাকে সৈন্ধব লবণ শুধু,
ফিরে দেখোনা আর, যা গেছে তা যাক !

এক্কা দোক্কার ছক কাটা মেঝের
প্রাচীন ফাটল থেকে,
পল্লবিত হোক অনন্ত জুঁইগন্ধ !

ধীমান চক্রবর্তী

ছোট-বড়

ছোটবেলায় শিখেছিলাম
কথা বলা
নিজের পছন্দের কথা সবাইকে জানানো
চোখ খুলে বহির্জগতের পরিচয় নেওয়া
তরুণ বাবার হাত ধ'রে পাড়ার মাঠে জোরে দৌড়োনো

এখন বড় হ'য়ে শিখছি
চুপ ক'রে থাকা
নিজের অপছন্দের কথা কাউকে না জানানো
চোখ বুজে নিজের ভিতরের জগৎটাকে চেনা
বৃদ্ধা মায়ের হাত ধ'রে পার্কের ধার ঘেঁষে খুব আস্তে হাঁটা

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম
বড়দের মতো স্বাধীন হবার

এখন বড় হ'য়ে স্বপ্ন দেখি
শিশুর মতো সরল হবার।

শঙ্খ ভৌমিক

দুটি কবিতা

১

বৃষ্টি তো এল, তুমি এলে না
রাত ফিকে হল, তুমি তো এলে না
গলি ভিজে গেল, বাস্তুসাপ চলে গেল,
নৌকা বেয়ে এক কিশোর যৌবনে পৌঁছে গেল —
আর তুমি ?
এখন বর্ষাতি আছে, BMW আছে
ব্যাক-টু-ব্যাক ক্ল্যায়েন্ট মিটিং চলছে
সিঙ্গাপুরের সান্ধ্য লিপস্টিক ধুয়ে যায় প্যারীর ডুভ্যায়
সময় কোথায় — গাঙ-এ জোয়ার আসার ?

২

সারারাত তোমার জন্য একটা কবিতা
ছটফট করছিল পেনের ডগায়, ঠোঁটের উষ্ণতায়,
নেমে আসা চাঁদের দোলনায় —
যন্ত্রণায় কাতর রাতের ট্রেন
পাড়ি দেয় নিশ্চিন্দিপুর
আর পাতা উল্টে
পৌঁছে যায় সাস্কাচুয়ান
যেখানে কোলিয়ারি মিশে গেছে বালিয়াড়িতে ।
অথচ সিলিকন জানলায় তখনো
পশ্চিমের সূর্যাস্তের প্রশান্তি —
পাতা খসে ফেসবুক দেওয়ালে
পড়ে থাকে হাসিমুখ লুকোনো ফাটল
আর কবিতার অন্তর্ধান রহস্য সমাধানে
তুমি জেগে থাকো কখন জ্যোৎস্না পড়বে দখিন জানলায় —
পাণ্ডুলিপি রং পালটায় কোণের আলমারিতে
জানলায় আশাবরি গেয়ে যায় পুবের পাখিরা
সমুদ্রস্নান শেষে তোমার চোখের বিষণ্ণতা
ফিকে হওয়া সিঁথির রং, বিস্মৃত আলতার ছাপ
সুদূর দিগন্তে তাকিয়ে অস্ফুটে জানতে চায়
‘‘বন্ধু, কত দীর্ঘ এই নিউক্লিয়ার শীতের সন্ধ্যা’’?

আনন্দ সেন

আসছে সে দিন (মূল কবিতাঃ ফইয়াজ)

আমরাও তো সাক্ষী হব
সাক্ষী হব সুনিশ্চিতে সেই সে দিনের
কথা ছিল আসবে যে দিন অঙ্গীকারে
লেখা ছিল যা তমসুকে, অন্তহীনের ।

অত্যাচারের পাহাড় যখন
তুলোর মত ধুলায় মেলায়
হে নেতাগণ
পায়ের তলায় রাখছ যাদের
তারাই যখন মাটি কাঁপায়
দেখবে তখন ভাঙছে আকাশ
ভাঙছে আকাশ বজ্রাঘাতে
তোমাদের ঐ দামী মাথায় ।

ঈশ্বরের এই বাগান থেকে
মিথ্যা যাবে অনেক দূরে
মুকুট তখন টুকরো হবে
এ মসনদ ও উলটে যাবে
আসবে তুফান রাজ্য জুড়ে।

আমরা তখন, বিশ্বাসী মন
এতটা কাল ছিলাম যারা নির্বাসনে
তারাই তখন বসব এসে সিংহাসনে

শুধু যে নাম থাকবে বেঁচে
সে ঈশ্বরের
যাকে কেউ দ্যাখেনি, যে তবুও আছে
যে দেখছে সবই, আর দ্যাখাচ্ছে।

আকাশ, বাতাস সব ছাপিয়ে
উঠছে জেগে একটি ধ্বনি
'সত্য আমিই, ঈশ্বর আমি'
আমিই তো সে
তুমিই তো সে ।

রাজা হবে এবার মানুষ
সেই তো রসুল, সেই ভগবান
আমিই তো সে
তুমিই তো সে ।

শ্রাবনী রায় আকিলা

আপনার আজকের দিনটি

দূরে কোথাও আগুনে পুড়বে শেষ সবুজ,
শীতের রুক্ষ ঠোঁট চাইবে আদ্রতা –,
ঋতু বদলের দ্বিধায় ধূসর দিন
প্রাক্তন প্রেমিকের কণ্ঠস্বরের থেকেও
বেশি নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকবে !!

সৌমিত্র চক্রবর্তী

এখন, এ' সময়ে

আমার একটু মানুষ কম লাগবে
পাখি এবং গাছ-গাছালিই থাকুক
আমার একটু মানুষ কম লাগবে
বুক ভেতরে আদিম মানুষ জাগুক।
আমার একটু মানুষ কম লাগবে
মানুষ এবং যাবত উপকরণ
মরতে মরতে বাঁচার চেয়ে বাঁচুক
বাঁচার ছলে বরণীয় এক মরণ।

আমার একটু মানুষ কম লাগবে
লাগার বলতে আদিগন্ত শালভূমি
আমার একটু মানুষ কম লাগবে
এমনকি মায়া, এমনকি প্রিয়া তুমি।

বাসবী খাঁ ব্যানার্জী

চলে তো যাওয়াই যায়

রাতের খাবারের পর বললাম
বেরচ্ছি একটু, সিগারেট কিনতে।
সে চেঁচিয়ে বলল, চাবি নিতে ভুলো না
আমি ততক্ষণে বাচ্চাদের করি শান্ত।

বেরিয়ে যাই দরজাটা পিছনে টেনে দিয়ে নিঃসাড়ে
নিয়ন আলোকিত সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে।
এখানের বাতাস সংকীর্ণতায় ভ্যাপসা,
সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মনে এল সহসা।
কেমন হয়, যদি আজ ফিরে না যাই?
যদি চলে যাই চিরদিনের জন্য?
আমাকে তো যেতেই হবে চিরতরে!

আমি যে এখনো পর্যন্ত ন্যুইয়র্কে যাই নি
না গেছি আজ অবধি হাওয়াইতে।
না হেঁটেছি ছেঁড়া জীন্স পরে সানফ্রানসিস্কোর পথে।
আমি এখনো পর্যন্ত ন্যুইয়র্কে যাই নি।
না বোধ করেছি নিজেকে ঠিক স্বাধীন
আজ অবধি।

কেমন হয় যদি এখনি এই উন্মাদনার বশে
সব বাধাকে দু'হাতে সরিয়ে বেরিয়ে পড়ি, এখনি!
খোলা হাওয়ায় পথে পা দিতেই মনে ঝলকাল
মানিব্যাগে আছে কার্ড, ইউরো, পাসপোর্টও
সঙ্গেই আছে যা কিছু প্রয়োজনীয়।
তাহলে? কেন নয়?.
চলে তো যাওয়াই যায়!

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

মায়ের কোটর যেই ছেড়েছি
  বেরোই গুটীগুটি,
বাইরে দেখি সক্কলেতে
  করছে ছুটোছুটি।
ছুটো এবং ছুটি।

যেই না দাঁড়াই দুই পায়েতে
  পড়াশোনা ধরলো টুঁটি
অ ই ঈ উ-র মারপ্যাঁচে-তে
  দিলাম লুটোপুটি।
লুটো এবং পুটি।

"আরও অনেক পড়তে হবে"
  ধরা আছে টুঁটি!
"আরোওওও দূর ছুটতে হবে,
  নইলে শুকনো রুটি"
  ও! তাই?!!
  লম্ফ দিয়ে ছুটি।

ছুটি আর ছুটি ...
  পড়তে ছুটি
  গড়তে ছুটি
  কম্মে ছুটি
  ধম্মে ছুটি
  খেলতে ছুটি
  গিলতে ছুটি
  দুঃখে ছুটি
  হাসতে ছুটি
  শ্বাস নেবো দু'টি?
  ছুটিতেও ছুটি!
ছুটি এবং ছুটি ...

পাকে পাকে ছুটোছুটি
  পাকাপাকি-র পাকে উঠি
হাত বাড়িয়ে দেখি তারা
  জ্বলছে সে' ফুট্‌ফুটি
"তোমার তারায় ঠাঁই হবে কি
  যাবো গুটিগুটি
তোমার তারায় না-ই বা ছুটি
  একটু দেবে ছুটি?!"

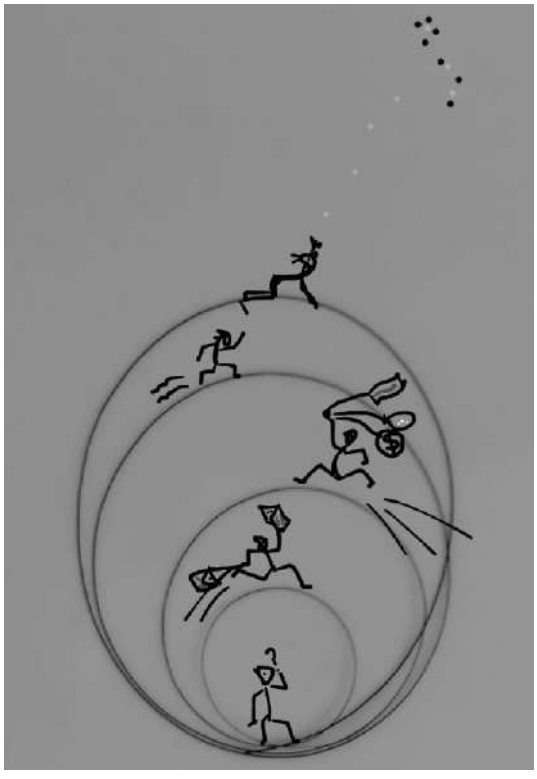

ইন্দিরা চন্দ

অমোঘ

ঐ সেতারের তান শুনতে পাচ্ছো?
তার না বলা বাণীর ঝংকারে কি সমবেদনা বাজছে?
কার জন্য বলতে পারো?

কে সে যার করুন আর্তি চোখে জল আনে?
সে কোন অজানা বাতাস যে নীলচে ঠোঁটে হাসি ফোটায়?
জানো তোমরা কেউ?

একটি ফুলের পাপড়ি দীঘিতে ঝরে পড়লে,
জলের বলিরেখা তরঙ্গায়িত হয়ে জানায়
স্থিতি আর প্রলয়ের মাঝে
আছে এ জীবন

চিরাচরিত জীবনযুদ্ধের অবসন্নতা কাটিয়ে ওঠার অদম্য নেশায় যে অজানা অনাগত আবছায়ার হাতছানি দেখা দেয়
তাকে দেখে ভয় হয়,
মাথার ওপর আকাশ
আর মাটি ওপর ঐ আকাশচুম্বি অট্টালিকার মাঝে
আমরা রোজ গড়ি তাসের ঘর
শুধুমাত্র ভেঙে চুরমার হবার জন্যই

এ দুনিয়া কি কেবলই দখলদারির?
কেড়ে নেবার নির্লজ্জতায় মগ্ন?

রূঢ় বাস্তবতার আলোয়
এ সত্য
স্বচ্ছ ও স্পস্ট।

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল

দেওয়া নেওয়া সময়ের কাল কিবা আজিকে,
ভুল করে কোনোদিন খুঁজে নাও নিজেকে।
খুঁতখুঁতে মনে যদি এলোমেলো হাওয়া দেয়,
ভুল করে মনটাকে হাট করে খোলা যায়।
চোখ জুড়ে আসে যদি কান্নার সারি মেঘ,
হেঁসে ফেলো ভুল করে, তুলে রেখো সে আবেগ।

রোজকার ভুলে মেতে, যাতায়াত ট্রেনে-বাসে,
সুযোগের গোলমালে কবি যায় অফিসে।
উকিল বা ডাক্তার ভুল করো পোশাকে,
মাঝরাতে ছাদে উঠে চাঁদটাকে ডাকে সে।

গেঁয়ো যোগী গ্রামে ছিল, ঝুলি খালি ভিক্ষার।
ভুল করে শহরেতে চলে আসা বারবার।
এটা চাই ওটা চাই, ভুল করে সব খাই।
হাভাতের হাঁড়ি খালি, বৃথা আশা পুড়ে ছাই।

পড়াশুনা অজুহাত খিদে-পেট আনচান,
একবেলা খেয়ে শিশু হয়ে যাবে বলীয়ান।
ভুল করে তুমি যদি লেখা-পড়া করো ভাই,
বেকারের সংখ্যাতে যোগদান করা চাই।

এর ভুল তার ভুল, সুযোগের ব্যবহার,
অভ্যাসে ভুল করে গড়ে ফেলো সরকার।

আপোষের ভুলে মজে তুমি হলে পরাধীন,
বোবা-কথা বুক জুড়ে জেগে আছে রাত দিন।
আদাজল খেয়ে তুমি উঠে পড়ে লাগো ভাই,
ভুলে ভরা সমাজের ভুলটাকে ধরা চাই।

Debasish Gooptu

HAVING LOVED YOU

(Translated from the original in Bangla by Jibanananda Das)

Bright they shine in daybreak's light –
Droplets of water on lotus leaves;
Whence do they come, in the blink of an eye,
Whence do they depart with the night ?

For many births, I harbored an ache in my heart;
And so you took birth as a lotus leaf this time;
As dewdrops of the dark,
The sound of dewfall on lotus leaves,
Dripping throughout the night.
What a challenge though to confine
Little droplets within those leafy binds.

Restive yet, yearning for lasting love,
This droplet, mine, I merged in yours upon a lotus leaf;
Aglow in your glow,
Your virtues I acquired,
Tender in hope of an endless love that abides.
Alas, how ephemeral is life!

Still have I gained a grain of life's truth:
This likeness, yours and mine, upon a lotus leaf.
Blue skies, the earth this sweet,
Buoyant sunshine,
The paddy-husking pedal's steady see-saw;
Quivering lotus leaves –
The droplets shake and shift –
The lotus leaves run dry.

তোমাকে ভালবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল;
তবুও এ জল কোথা থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চলে যায় ;
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।
আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিলো ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা;
হয়েছো তুমি রাতের শিশির –
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর;
তবুও পদ্মপত্র এ জল আটকে রাখা দায়।
নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল;
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।
এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল;
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভাসছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে;
পদ্মপাতার জল নিয়ে তার – জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

জীবনানন্দ দাশ

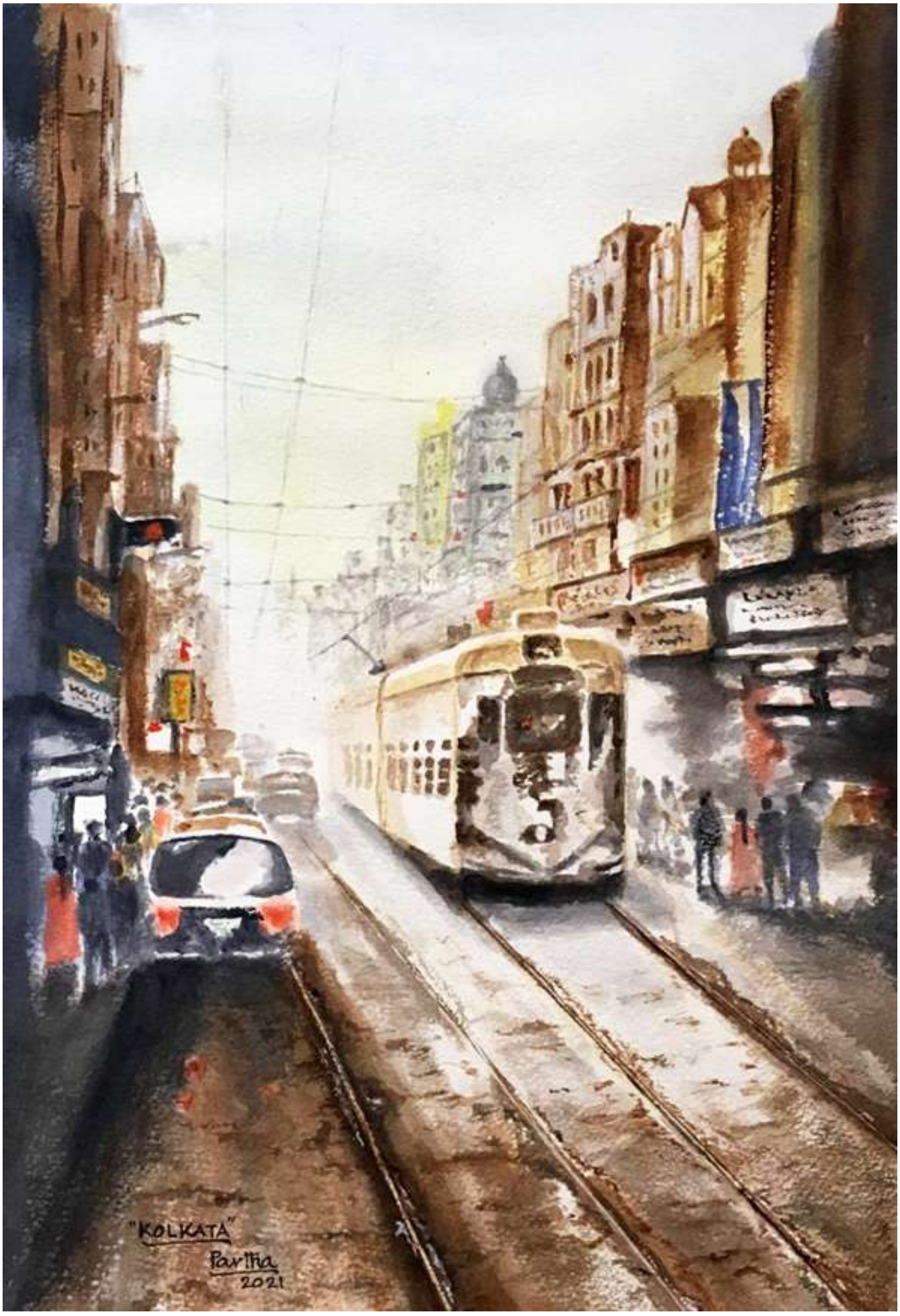

"Kolkata" ... tumio hete dekho Kolkata ... jabe ki aamar sathe ...
My humble tribute to our beloved kolkata
In watercolour on paper

শ্যামল দাশগুপ্ত

শংকর – বাংলা সাহিত্যের উপেক্ষিত নায়ক

১৯৬২ সাল। দে'জ পাবলিশিং থেকে এক অনামা লেখক শংকরের চৌরঙ্গী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। না, কোনও শোরগোল ফেলতে পারে নি। বরঞ্চ, কিছুটা উল্টোই ঘটেছিল। বাংলার বিদগ্ধ সাহিত্যসমাজে চৌরঙ্গী কোনও কক্কে পায় নি সেদিন। শংকরের ভাষায়, "প্রথম দিন থেকেই সমালোচনা যে রেস্টুরেন্ট আর রেস্তোঁরার তফাত বোঝে না, সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই!" এক নামী লেখিকা 'দেশ' সম্পাদককে চিঠি পাঠালেন অশিক্ষিতের উপন্যাস অভিযোগ করে। বললেন, "যে লোকটা 'ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'-এর সঙ্গে 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'-কে গুলিয়ে ফেলতে পারে সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই। না কোনও পুরস্কার জোটেনি। একটু সত্যের অপলাপ হল, একটা পুরস্কার 'চৌরঙ্গী' পেয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বাইন্ডিং-য়ের জন্য"। যতদূর শোনা যায় 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠী শংকরকে লেখকই মনে করতেন না।

পরেরটুকু কিন্তু ইতিহাস। বহুবছর ধরে চৌরঙ্গী উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের 'বেস্টসেলার' এর শিরোপা পেয়েছে। ২০১২ সাল পর্যন্ত চৌরঙ্গী উপন্যাস এর ১১১ (একশ এগারো) টি সংস্করণ বেরিয়েছে। আর্থার হেইলির বিখ্যাত উপন্যাস "Hotel" র থেকে তিন বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, শংকরের চৌরঙ্গী, এই তথ্য একারণেই উল্লেখ্য যে, পল্লবগ্রাহীরা একসময় দাবী করেছিলেন যে, এই "Hotel" উপন্যাসের অনুকরণে নাকি চৌরঙ্গী রচিত হয়েছিল। মালয়ালাম, মারাঠি, হিন্দি, রাশিয়ান, ইংরেজি সহ সাতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে লেখাটি।

একটা সময়ে চৌরঙ্গী পড়েনি এমন শিক্ষিত বাঙালি খুঁজে পাওয়া যেত না। শংকর ছিলেন কুশলী গল্প বলিয়ে বা 'story teller'। তার নির্মিতির মধ্যে আধুনিকতা বা উত্তর আধুনিকতার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় নি, বরং একটা নিপাট কথকতার ঘরানার এক ছাপ পাওয়া যায়। তিনি খুব সাবলীলভাবে গল্প বলে যান, মগ্ন পাঠক পাতার পর পাতা উলটে যান, কিন্তু শেষ পাতায় পৌঁছে আপসোস করেন তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার জন্য।

'চৌরঙ্গী' উত্তরকালে, বাংলা উপন্যাস তখন স্বকীয়তায় ঝলমল করছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্য প্রয়াত হয়েছেন, তারাশঙ্কর তখনও লিখছেন। ছয়ের দশকের শেষে, সমরেশ বসুর ছায়া বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। রাজনীতিতে তখন একটা অস্থির হাওয়া বইছে, বামপন্থী রাজনীতি চলে যাচ্ছে চরমপন্থার দিকে। খাদ্য আন্দোলন, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ এর সাথে দামামা বাজতে শুরু করেছে নকশালবাড়ীর আন্দোলনের, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে বাংলার পরিস্থিতি, খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সামনের সারিতে উঠে এসেছে। কিন্তু সেই যৌবনের উচ্ছ্বাস এর কোনও আগাম পূর্বাভাষ পাওয়া যায় নি, 'চৌরঙ্গী', উপন্যাসে। পক্ষান্তরে 'চৌরঙ্গী' এনে দিয়েছিল বসন্তের কোমল পরশ, বাঙ্গালীকে মজিয়ে দিয়েছিল, সে মুগ্ধতা আজও সমানভাবে বজায় আছে। আর লেখক শংকরের সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পেতে পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও সাতটি বছর, যখন, তার শংকর সামাজিক সচেতনতার ছাপ রেখেছিলেন, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তার জন-অরণ্য উপন্যাসে।

সুধী সমালোচকেরা শংকরের তিনটি উপন্যাসকে ট্রিলজি আখ্যা দিয়ে এক বিন্দুতে নিয়ে এসেছেন, "কত অজানারে" দিয়ে যে গল্পের শুরু, "চৌরঙ্গী'তে" যার বাক বদল, "ঘরের মধ্যে ঘর-এ" এসে সেই গল্পটা পূর্ণতা পেল যেন। বাংলা সাহিত্যের অসামান্য একটা ট্রিলজি পাঠককে হাসাবে,ভাবাবে এবং কখনো কখনো হয়তো চোখের কোণটা ভিজেও আসতে পারে। এই সিরিজেরই তৃতীয় উপন্যাস ঘরের মধ্যে ঘর। আটশো পাতার বৃহৎ কলেবরের বইটি অবশ্য অন্যদুটির তুলনায় খানিকটা ম্রিয়মাণ।

আপনাকে ঘুরে আসতে হবে চার্নক সাহেবের কলকাতার থ্যাকারে ম্যানশনে, এক গল্পের থেকে আর এক গল্পকে পরতে পরতে খুলে দিয়েছিলেন এক জাদুময় বাস্তবে। তবে "কত অজানার", "চৌরঙ্গী" যারা এই উপন্যাস দুটো পড়েছেন, তারা স্বীকার করবেন শংকরের জাদু-মাখা লেখা একবার ধরলে শেষ না করে ওঠা মুশকিল। শঙ্কর লিখেছেন প্রচুর, বিচরণ করেছেন বহু বিষয়ে, সামাজিক উপন্যাস ছাড়াও, লিখেছেন ভ্রমণ রসসিক্ত কয়েকটি রচনা, রচনা করেছেন মহা-জীবনের কথা, তার প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় শতাধিক। কত অজানারে, চৌরঙ্গী ছাড়া রয়েছে নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি, মানচিত্র, পাত্রপাত্রী, রূপতাপস, এক দুই তিন, যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ, নগরনন্দিনী, বিত্তবাসনা, মরুভূমি, কামনা বাসনা, ঘরের মধ্যে ঘর, সম্রাট ও সুন্দরী, পটভূমি, সীমান্ত সংবাদ, বাংলার মেয়ে, মুক্তির স্বাদ, সোনার সংসার, চরণ ছুঁয়ে যাই, জন অরণ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যেখানে যেমন ইত্যাদি। উপন্যাস ছাড়াও শংকর আরও নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর অনেকগুলি বই আছে। এসব বইয়ের লক্ষাধিক কপি মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্য খুবই জনপ্রিয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে, 'এপার বাংলা ওপার বাংলা', 'জানা দেশ অজানা কথা', 'মানবসাগর তীরে' ইত্যাদি। নানা ধরনের স্মৃতিমূলক রচনা লিখেছেন তিনি। এগুলির মধ্যে তিন খণ্ডে লেখা, 'চরণ ছুঁয়ে যাই' বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিমল মিত্র তাঁর মতে, 'আধুনিক কালের মহত্তম ঔপন্যাসিক।' তিনি লিখেছেন, 'আমার সাহিত্যজীবনে পরম পাওয়া দুজন সৃষ্টিধরের সান্নিধ্য। একজন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজন বিমল মিত্র।'

শংকরের আরেক জনপ্রিয় উপন্যাস 'আশা আকাঙ্ক্ষা'। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ স্বদেশী উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল সিন্ধ্রি সার কারখানা। ভারী ও বৃহৎ শিল্পের সেটা ছিল এক অনন্য নজীর। যেসব তরুণ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উদ্যোগে তা সফল হয়েছিল, তাকে সাহিত্যের পাতায় অমর করে রেখেছিলেন শংকর। এই উপন্যাসের ভূমিকায়, লেখক লিখেছিলেন যে 'আমাদের এই ভারতবর্ষে, তারা নীরবে যে আশা আকাঙ্ক্ষার স্বর্গলোক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, তা সার্থক হোক, দেশ-জননীকে তারা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা করুন এই প্রার্থনা'। এভাবে কেউ আগে বলেননি, তিনি এক মহান জাতীয়তাবাদের বোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাকে শ্রদ্ধা জানানোর সময় আমরা লেখকের এই দিকটা যেন বিস্মৃত না হই।

শঙ্কর সে অর্থে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহন করেননি। আইনজীবী বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই চলে আসেন বনগাঁ থেকে কলকাতার ওপারে হাওড়ায়। সেখানেই শংকরের বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা ও সাহিত্য সাধনার শুরু। বাবার অকাল মৃত্যুর পর সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন, বাস্তবের কঠিন মাটিতে। জীবনের শুরুতে কখনো ফেরিওয়ালা, টাইপরাইটার ক্লিনার, কখনো প্রাইভেট টিউশনি, কখনো শিক্ষকতা অথবা জুট ব্রোকারের কনিষ্ঠ কেরানিগিরি করেছেন। এক ইংরেজের অনুপ্রেরণায় শুরু করেন লেখালেখি। শাহজাহান হোটেলের চাকরদের সাথে একসাথে বাস করে, লক্ষ্য করেছেন ক্যাবারে ড্যান্সারদের জীবন, কেরানীকুলের কাজকর্ম, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রথমদিকে, গত শতকের মধ্যভাগের আগে থেকে, বঙ্কিমি যুগের পরপর সাধু ভাষা বা কেতাবি ঢং এর সঙ্গে কথ্য বা লৌকিক ভাষার এক সাহিত্যিক দ্বন্ধ বিকশিত হয়েছিল। বঙ্কিমি যুগের পরবর্তী সময়ে, বাংলা উপন্যাসের ভাঙচুরের সময়ে, বাঙ্গালীর রোজকার, দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা, আস্তে আস্তে গল্পে, উপন্যাসে জায়গা করে নিচ্ছিল। শুরুটা হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার চলার পথকে মসৃণ করেছিল। বাংলা উপন্যাস তার পাখায় পেয়েছিল সহজাত ছন্দ, পথ চলার আনন্দ। সেই পথে হেটেছিলেন শঙ্কর, সেই আনন্দের ডালি নিয়ে সাজিয়েছিলেন একের পর এক তার রচিত উপন্যাস। শংকরের রচনা ছিল সহজ, সোজা-সাপটা, তাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কথা থাকত, তাতে দুধ-ভাতের গন্ধ ছিল।

গোড়া থেকেই শংকরের যাবতীয় লেখার কেন্দ্রে রয়েছে, মধ্যবিত্ত জীবন। এই জীবনেরই নিটোল গল্প বলেন তিনি, যে গল্পে সবকিছুই পরিষ্কার, যেখানে কোনও রকম অস্বচ্ছতা নেই। শংকর কোনও রহস্যময়টা বা আলো-আধারি পছন্দ করতেন না। প্রতিটি চরিত্রকে পাঠকের চোখে স্পষ্ট করে তোলেন। শংকরের লেখাগুলো পড়লে এই সমাজকে, নাগরিক, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজকে চেনা যায়। শংকরের সাহিত্য গুরু বিমল মিত্রের যাবতীয় লেখার কেন্দ্রে যদি থাকে, 'ইতিহাস', তবে শংকরের ক্ষেত্রে তা হল সমাজ।

জীবনের শেষ পর্বে, শঙ্কর ক্রমেই মূলত রম্য গদ্যের দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁর যে কোনও উপন্যাসে একটা রম্য-রচনার মেজাজ আছে। আর বাস্তবিকই, রম্য-রচনার জন্যই জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে তিনি আকাদেমি পুরস্কার পেলেন। শংকরের উপন্যাস আমাদের ভাবায় না, তা আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীগুলোয় নাড়া দেয়। তিনি একজন আবেগপ্রবণ লেখক। এতটাই যে, তা পাঠকের চোখে জল এনে দিতে পারে। নাটকীয় ঘটনার ঘনঘটার পাশাপাশি গুরুগম্ভীর মূল্যবোধের নানা কথায় শংকর পাঠককে মজিয়ে রাখতে জানেন। জনপ্রিয়তার নিরিখে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিকভাবে শংকরের উল্লেখযোগ্য অবস্থান অনস্বীকার্য।

প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক, শংকর এখনও লিখছেন, তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন বিপুলভাবে এবং এখনও করছেন। তিনি আমাদের ঋণী করেছেন তাঁর এই বিপুল অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি আমরা দিই নি, জীবনের শেষ বেলায় আকাদেমি পুরস্কার নিঃসন্দেহে এই উদাসীন উপেক্ষাকে প্রশমনের এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হবে।

“Kolkata” ... tumio hete dekho Kolkata ... jabe ki aamar sathe ...
My humble tribute to our beloved kolkata
In watercolour on paper

রমা জোয়ারদার

নজর

কদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। মেঘলা আকাশ, বেলা তিনটে হতে না হতেই প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে! ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। খেলার মাঠটায় অনেকটা জল জমে গেছে।

শহরের এদিকটা এখনো বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু বাড়ি তৈরী হয়েছে এবং সেখানে লোকজনও থাকছে ! কিন্তু বসতি এখনো জমে ওঠেনি। চারিদিক একেবারে শুনশান ! যে যার ঘরে হয় বিশ্রাম করছে, নয় তো কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

এই সময়ে বৃষ্টির মধ্যে জলে ছাপুর ছুপুর করতে করতে একটা এগারো-বারো বছরের মেয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে এল। তারপর সোজা গিয়ে সেই জমা জলে পা ডুবিয়ে দু' হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল ! ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এইভাবে ভিজতে ও দারুণ মজা পাচ্ছে ! মুখটা আকাশের দিকে তোলা। ভেজা চুল মুখে চোখে লেপটে আছে। বন্ধ চোখের পাতায় জল আটকে আছে। চাপা ঠোঁটে মিষ্টি একটা হাসি। বন্ধ চোখ দুটো মাঝে মাঝে একটু খুলছে, আবার বন্ধ করে ফেলছে। দেখতে দেখতে ওর পাতলা সুতির ফ্রকটা একেবারে ভিজে গেল। ফুলের কুঁড়ির মত ছোট্ট শরীরটা ওর ভিজে জামার আড়াল ভেদ করে ফুটে উঠল। ও কিন্তু সেসব গ্রাহ্যই করল না।

মাঠের ধারে একটা ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির বারান্দায় একজন বয়স্ক মানুষ বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। এক সময় তার চোখ দুটো খবরের কাগজের পাতা থেকে সরে গিয়ে, ওই বাচ্চা মেয়েটার উপর পড়ল ! চুম্বকের মত দৃষ্টি আটকে গেল তার বৃষ্টি ভেজা শরীরে ! লোকটা গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি গায়ে মেখে মেয়েটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

চোখ খুলে হঠাৎ সামনে একটা বুড়ো লোককে দেখে মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে ওখান থেকে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়ে লোকটা মেয়েটার কাঁধ দুটো চেপে ধরে বলল – "পালাচ্ছিস কেন ? ভয় পাচ্ছিস ? কোনো ভয় নেই !" আধ-ফোকলা দাঁত বার করে অদ্ভুত ভাবে হাসতে হাসতে বুড়ো লোকটা তার ঘোলাটে দুটো চোখ দিয়ে মেয়েটার শরীরটাকে গিলছিল।

ছোট্ট মেয়েটা ততক্ষণে সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেছে ! সে লোকটার হাত ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। লোকটার হাতদুটো ততক্ষণে ওর কাঁধ থেকে শরীরে নেমে এসেছে। তার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতেই, মেয়েটা কান্না জড়ানো গলায় বলল – "আমাকে ছেড়ে দাও, দাদু ! আমার খুব ব্যথা লাগছে !" লোকটা তাতে আরো বেশি করে হাসতে লাগল !

এই সময় ওই লোকটার বাড়ির বারান্দায় একজন ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের মহিলা এসে দাঁড়ালো। একটু ভারি চেহারায় হাল্কা রঙের একটা তাঁতের শাড়ি সাদাসিধে করে পরা, মাথার কাঁচা পাকা চুল হাতখোপা করে বাঁধা। মহিলা বারান্দা থেকেই মাঠের জল-কাদার মধ্যে দাঁড়ানো তার স্বামীকে দেখতে পেল। একটুও সময় নষ্ট না করে সে মাঠের দিকে হাঁটা দিল। একটু এগোতেই পুরো ব্যাপারটা তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তার স্বামীটি তখন তার বিকৃত যৌন লিপ্সা মেটাতে এতই ব্যস্ত যে তার পিছনে কোথায় কি ঘটছে সেটা সে খেয়ালই করল না!

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পেছনে এসে মহিলাটি তার স্বামীকে খুব জোরে এক ধাক্কা দিল ! লোকটা জমা জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল ! নড়ল না, চড়ল না, শুধু পড়েই রইল !

ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যস্ত ভাবে মহিলা তাকে বলল – "পালা ! এক্ষুনি এখান থেকে পালা। সোজা বাড়ি যাবি। কোথাও দাঁড়াবি না। কারো সাথে কথা বলবি না !"

ছোট্ট মেয়েটা উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে দৌড়াল। মেয়েটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই মহিলাটি ডুকরে কেঁদে উঠল! নীচু হয়ে স্বামীকে ঠেলে সোজা করল। তার চিৎকার, চেঁচামেচিতে এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন লোক জড়ো হল। সবাই প্রশ্ন করতে লাগল

– "কি হয়েছে ?"

– "কি করে হল ?"

– "এই বৃষ্টি বাদলার দিনে এখানে কি করছেন ?"

বিপন্ন মহিলাটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল – "মানুষটার আজকাল মাথারই ঠিক নেই ! আমি ঘরে অন্য কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম। আর সেই ফাঁকে ইনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন !" সবাই মিলে ধরাধরি করে বুড়ো লোকটাকে ঘরে নিয়ে গেল। শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফেরানো হল। ঘরে আসা লোকজন বলল – "এই তো, মেসোমশাই-এর জ্ঞান ফিরে এসেছে। ব্যস, এবার আর কোন ভয় নেই, মাসীমা !"

– "ওনাকে একটু গরম দুধ খাইয়ে দিন, দেখবেন এখনই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন !"

– "আমরা তাহলে এবার চলি। তবে আপনি নজর রাখবেন, যাতে উনি এভাবে আর বেরিয়ে না পড়েন !"

– "ভাগ্য ভালো যে এবার অল্পের উপর দিয়ে গেছে ! তেমন কিছু হয়নি বা চোটও তেমন পাননি। কিন্তু সবসময় এরকম নাও হতে পারে ! তাই আপনি খেয়াল রাখবেন ।"

অত্যন্ত জোর দিয়ে মহিলাটি বলল – "একদম ঠিক বলেছ। তোমরা ছিলে বলেই আজ ওনাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলাম। এ ভুল আর আমি করব না। এবার থেকে সবসময় বাইরের দরজায় তালা দিয়ে রাখব। একলা হুট-হাট বেরোতেই পারবে না !"

– "সেই ভালো। দরজায় তালা দিয়ে রাখুন ।"

বাইরের লোকেরা সব বেরিয়ে যেতেই মহিলাটি দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা নিজের আঁচলে বেঁধে রাখল। এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা স্বামী এবার উঠে বসল। চোখ বড় করে স্ত্রীকে ধমকে বলল – "এর মানে কি ? তুমি কি আমাকে তালাবন্ধ করে রাখবে নাকি ? এত বড় সাহস তোমার !"

আগুন চোখে তার দিকে তাকাল স্ত্রী! সাপের মত হিসহিস করে বলে উঠল – "চুপ ! একদম চুপ। বেশি তেড়িবেড়ি করলে দরজা খুলে এক্ষুনি ওদেরকে আবার ডাকব। তোমাকে সোজা পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবো !"

কয়েক পা এগিয়ে এসে স্বামীর চোখে চোখ রেখে সে আরো বলল – "শোনো, তোমার কীর্তি-কলাপ সবই আমি দেখে ফেলেছি ! ছি, ছি ! ভাবলেই আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে ! একদম চুপ করে থাক। না হলে, আমি পুলিশ ডাকব। একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে নোংরামি করার অপরাধে তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে, তারপর জেলে পুরে দেবে ! কোনটা পছন্দ ? পাগলা গারদ ? না কি জেলখানা ?"

কোন উত্তর এলো না ! জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল !

সুজয় দত্ত

সমাধান

"আজ আপনাকে একটু বেশীই ক্লান্ত লাগছে যেন –"

"কই, না তো –"

"বললেই হল ? জানেন তো আমার ভুল হয়না এসব ব্যাপারে ।"

"হ্যাঁ, মানে, ওই – আজ প্রাইভেট বাস ধর্মঘট তো, পুরোটা পথ অটো বদলে বদলে আসতে হল, তাই –"

"ও, আচ্ছা । শুনেছিলাম বটে । ফেরার সময় ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন । অটোর ঝামেলা আর করতে হবে না । শিউপ্রসাদকে বলে রাখব, ডেকে দেবে ।"

"না না, কী দরকার ? অটোতে তো এমনি কোনো –"

"ব্যস ব্যস । আর কথা নয় । ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন । যান, টিচার্স কাউন্সিলের মিটিংটা আজ খুব ইম্পর্টেন্ট । আপনি না গেলে শুরু হবে না ।" "হ্যাঁ স্যার" বলে দ্রুত পা বাড়ায় শিল্পী । দোতলার সিঁড়ির দিকে । পনেরো ধাপ সিঁড়ি, উঠেই ডানদিকে টিচার্স রুম । "অভিভাবকদের তরফ থেকে যে কমপ্লেনগুলো এসেছে, তার সবকটা নিয়েই কিন্তু আলোচনা দরকার । নাহলে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ সহজে ছাড়বে না ।"

শান্ত, ভরাট গলাটায় সামান্য উদ্বেগের আভাস । শুনে পিছন ফেরে শিল্পী, আশ্বাস দেয়, "চিন্তা করবেন না স্যার, আমাদের জবাবও তৈরী । পয়েন্ট বাই পয়েন্ট । খসড়া আমার ব্যাগেই আছে ।"

"ঠিক আছে তাহলে । ফাইনাল করার আগে আমাকে একসময় শুনিয়ে যাবেন ওটা ।" হুইলচেয়ার এবার পিছন ফেরে, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে পাশের দরজা দিয়ে লাগোয়া সেক্রেটারীর ঘরের দিকে । হ্যাঁ, হুইলচেয়ার । কাঁকুড়গাছির সি আই টি মোড়ের অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ডিরেক্টর দীপ্তেন্দু সেন শেষ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আজ থেকে ঠিক চোদ্দ বছর একশো পঁচাত্তর দিন আগে । স্মৃতির ক্যালেন্ডারে একটা নাছোড়বান্দা দুঃস্বপ্নের মতো রয়ে গেছে দিনটা । ছাব্বিশে জানুয়ারী । উনি তখন ডিরেক্টর নন, প্রধান শিক্ষক । স্কুল কম্পাউন্ডে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলন হবে, তাই সাতসকালে বিবেকানন্দ রোডের বাড়ী থেকে মোটরবাইক চেপে আসছিলেন । আর মানিকতলা মোড় থেকে ওই রাস্তায় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে করতে আসছিল একই রুটের দুই যমদূত মিনিবাস । বাগমারীর একটু পরেই যখন ওভারটেক করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা দীপ্তেন্দুর বাইকে দুরন্ত বেগে ধাক্কা মারল, রাস্তায় লোকজন তেমন ছিল না । পুলিশও না । ছুটির দিনের সকাল বলে কথা । ছিটকে গিয়ে উল্টোমুখী রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল তাঁর অচৈতন্য, রক্তাক্ত দেহটা । ডান পা-টা সম্পূর্ণ চুরমার । পা হারালে তাও ক্রাচ আছে, হুইলচেয়ার আছে । কিন্তু চোখ ? সেদিনের সেই কুয়াশা-কুয়াশা ঠান্ডা সকালে সূর্যটা একটু দেরীতে উঠেছিল – মনে আছে আজও । তারপর আর কখনো সূর্যোদয় দেখেননি দীপ্তেন্দু । সেই ভীতু-ভীতু, জড়তামাখানো, নিষ্পাপ মুখগুলোকেও না – যারা প্রতিদিন সকালে প্রার্থনাসংগীতের লাইনে উনি গিয়ে দাঁড়ালে সমস্বরে বলত, "গুড মর্নিং, স্যার" । বলত মানে বলার চেষ্টা করত । অনেকেরই মুখ দিয়ে কয়েকটা অর্ধস্ফুট শব্দ বা গোঙানিই বেরোত শুধু । অনেকের সেটুকুও না । ওরা যে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো নয় । অলকেন্দু বোধ নিকেতন আসলে মূকবধির আর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটা বিশেষ আবাসিক স্কুল । সঙ্গে অটিজম স্পেকট্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা

ছেলেমেয়েও আছে। তাদের দেখাশোনা আর যতটা সম্ভব শিখিয়ে পড়িয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আছেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিশু-চিকিৎসক। আর আছেন কিছু মনস্তত্ত্ববিদ। সেই সূত্রেই শিল্পী রায়ের এখানে আসা। মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ, তিন ভাইবোনের মধ্যে ও-ই বড়। ছোটবেলা থেকেই ভাল ছাত্রী। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় মাকে হারাল ক্যান্সারে। তখন থেকে একহাতে সংসার সামলেছে, অন্য হাতে পড়াশোনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর করছিল যখন, অটিজম ছিল ওর স্পেশ্যাল পেপার। শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়টা ওকে টানতো, গবেষণার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী বাবা হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে আংশিক প্যারালিসিসে কর্মক্ষমতা হারানোয় তাড়াতাড়ি একটা চাকরি খোঁজা ছাড়া উপায় রইলনা। খুঁজতে গিয়ে দেখল সরকারী চাকরির পথে অনেক কাঁটা। ওপরমহলে বা রাজনীতির আঙিনায় জানাশোনাও তো তেমন নেই। এমনসময় কাঁকুড়গাছির এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিতে ইন্টারভিউ দিয়ে অফার পেয়ে যাওয়ায় খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছিল সেটা। পারিশ্রমিক ভাল, কিন্তু বেসরকারী স্কুলে যা হয় আরকি – শুরুতে লম্বা সময় ধরে প্রোবেশন। তাই নিশ্চিন্ত থাকার কোনো অবকাশ নেই। আজও মনে পড়ে, ইন্টারভিউয়ের দিন সেই পালিশ-করা লম্বা টেবিলটার উল্টোদিকে যে চারজন বসেছিলেন, তাঁদের বেশীরভাগই মনস্তত্ত্ব আর অন্য নানা বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন, শুধু একজন ছাড়া। চোখে কালো চশমা পরা মিতবাক সেই ভদ্রলোক শুধু শেষদিকে একবারই মুখ খুলেছিলেন। শান্ত, ভরাট গলায় জানতে চেয়েছিলেন, "বিজ্ঞাপনে যাই বলা থাক, ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে যাই লেখা থাক, আসলে আমরা কী খুঁজছি জানেন ? পৌনে একশো অভাগা, অসহায়, দুঃখী ছেলেমেয়ের জন্য একজন দরদী, স্নেহময়ী মা। বলুন, পারবেন সেই মা হতে ?" এমন আচমকা, অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে কীকরে যে সেদিন বলতে পেরেছিল "পারব স্যার -- মা না থাকার কষ্ট আমি জানি", আজও ভাবলে অবাক লাগে ওর।

পরে জেনেছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব সেই দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক ওই স্কুলের বর্তমান ডিরেক্টর। গত চব্বিশ বছর ধরে জড়িয়ে আছেন এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে। একদিন তিনিও ওরই মতো স্নাতকোত্তর-শেষে চাকরির খোঁজে এসেছিলেন এখানে। অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে নয়, প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী অপ্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে। প্রথমে অস্থায়ী সহকারী শিক্ষক, তারপর নিজের কর্মদক্ষতায় আর নিরলস পরিশ্রমে বছর দশেকের মধ্যে একেবারে প্রধান শিক্ষক। তাঁর সেই সময়কার সহকর্মীদের মধ্যে এখনো যাঁরা আছেন, শিল্পী তাঁদের কাছে শুনেছে কীভাবে অকৃতদার মানুষটি শুরু থেকেই এই স্কুলের সঙ্গে আর তার আবাসিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মনেপ্রাণে জড়িয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে, পরিবার ভাবতে শুরু করেছিলেন তাদের। আর তার পরেই সেই দুর্ঘটনা। একইসঙ্গে দৃষ্টিশক্তি আর চলৎশক্তি হারাবার পর যখন জানতে পারলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অকাল-অবসরের জন্য বেশ ভাল প্যাকেজ দিতে রাজী, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজকে নাকি বলেছিলেন, "এটা তো প্রতিবন্ধীদেরই স্কুল – আরেকজন প্রতিবন্ধীর জন্য একটু জায়গা হবে না ?" ব্যস, সেই থেকে বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে উনি এখানকারই বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ যোগ্য মর্যাদা দিয়েই রেখেছিল ওঁকে – ডিরেক্টরের বিশেষ উপদেষ্টা করে। স্কুলবাড়ীর লাগোয়া ছোট্ট একতলা গেস্টহাউসটার পূবদিকের দুটো ঘরই তাঁর গত চোদ্দ বছরের ঠিকানা। এমনকী বছর সাতেক বাদে সহকারী ডিরেক্টর আর তার চার বছরের মধ্যেই ডিরেক্টর হওয়ার পরও। ডিরেক্টরের জন্য বরাদ্দ মোটা আবাসন ভাতা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন – ও দিয়ে আরো কিছু ছেলেমেয়ের কমপয়সায় ভর্তির ব্যবস্থা করতে। প্রথমে এসব শুনে একটু আশ্চর্য লাগলেও বছর দুয়েক ভদ্রলোককে কাছ থেকে দেখার পর শিল্পীর এখন মনে হয়, ওরকমটা না হলেই বরং অবাক হওয়ার কারণ থাকত। হঠাৎ করে সবকিছু হারাবার পর মানুষ যখন তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে ধরে রাখার কোনো অবলম্বন পায়, তাকে অন্ধের যষ্টির মতো এভাবেই আঁকড়ে ধরে। তাছাড়া এই স্কুল আর তার আবাসিকদের প্রতি ওঁর ভালবাসাটা সত্যিই আন্তরিক। সেই ভালবাসা ওঁর সংস্পর্শে থাকতে থাকতে সহকর্মীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। শিল্পীরও গেছে। তাছাড়া এই দুবছরে ওর নিষ্ঠা আর দায়িত্ববোধ যে ভদ্রলোকের নজর এড়ায়নি সেটা ও বুঝতে পারে। আজকাল নানা ব্যাপারে ওর ওপর বাড়তি আস্থা রাখতে শুরু করেছেন তিনি। কিন্তু ওর তো আর এই স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যেই সমস্ত জগৎ-জীবন বাঁধা

পড়ে নেই। ওর একটা বাড়ী আছে, বাবা-ভাই-বোনের প্রতি দায়দায়িত্ব আছে, সামান্য হলেও নিজের কিছু শখ-আহ্লাদ আছে। আর এসবের বাইরেও অন্য একটা গল্প আছে, যা খুব বেশী কেউ জানেনা। বাড়ীর লোকেও না। সেই গল্পের নায়ক অবশ্য এখন অনেক দূরে। শুধু মোবাইলেই ধরা দেয় সে মাঝেমাঝে। আর তার সেই দূরাগত বার্তার প্রতীক্ষায় শিল্পীর নিজের অজান্তেই সারাদিন বারবার চোখ চলে যায় নিঃশব্দ করে রাখা মোবাইলটার স্ক্রীনের দিকে। ঠিক যেমন যেত এই কয়েকবছর আগেও কলেজ স্ট্রীটের কোনো চেনা বইয়ের দোকানে বা গড়িয়াহাটের মিত্র ক্যাফেতে বা ইস্টার্ন বাইপাসের রেলগেট মোড়ে তার অন্য অপেক্ষা করতে করতে। কাউকে সময় দিয়ে সময় রাখাটা কোনোদিনই ধাতে ছিলনা তার। চিরকালই একটু অবিন্যস্ত, অগোছালো। কী করে যে এখন মাল্টিন্যাশনালের ঘড়ি-ধরা কর্পোরেট কালচারের সঙ্গে মানিয়ে চলছে কে জানে। শিল্পীর মনে হত ও যেন বসন্তের একরাশ এলোমেলো হাওয়া – হঠাৎ কোথা থেকে অচেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে এসে চকিতে উষ্ণ আদরের পরশ দিয়ে যায়, স্নিগ্ধতার আবেশ রেখে যায়। ওদের প্রথম দেখাও এইরকম এক ঘটনার মধ্যে দিয়েই। একটা আধা-ছুটির দিনে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে একদল উচ্ছল ছেলেমেয়ে চুটিয়ে আড্ডা মারছিল। শিল্পী তখন ফার্স্ট ইয়ারে। সকলের সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয় হয়নি। পড়াশোনার বাইরে ইউনিভার্সিটি চত্বরে সময় কাটানোর অভ্যেসও তৈরী হয়নি। প্রতিদিন ক্লাস শেষ হলেই সোজা বাড়ী। কিন্তু থার্ড ইয়ারের মোনালিসাদির পাল্লায় পড়ে ও-ও সেদিন ওখানে। হঠাৎ আড্ডার মাঝপথে একটা বুকের বোতাম খোলা চকরাবকরা শার্ট আর জিন্স পরা ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে শিল্পীর দুপাশের দুই খালি চেয়ারের একটায় ধপাস করে বসে হাঁফাতে লাগল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, তীক্ষ্ণ নাকমুখ, গালে হালকা দাড়ি। ওকে দেখে টেবিলের উল্টোদিকে বসা অয়নাভ আর ইন্দ্রনীলের সরব অভিযোগ, "কী মাইরি তুই ? সেই পরশু থেকে বলা আছে ঠিক দেড়টায় এইট বি বাসস্ট্যান্ডে মীট করবো, আর তুই এখন থোবনা দেখাতে এলি ?"। ছেলেটি অপ্রস্তুত, কী অজুহাত দেয় ভেবে পাচ্ছে না, আমতা আমতা করে বলল, "কী করবো বস, ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট সেট আপ করা আছে কাল থেকে। মালটাকে নাবিয়ে তবে তো আসব ? নাহলে টিকেসি তো আবার খিস্তি মারবে। যাকগে, চল চল, এখন রওনা দিলে ট্রেলারটা শুধু হয়তো মিস করব ...."। শুনে সঙ্গীরা আরো খাপ্পা, "মানে ? তোর শ্বশুরের হেলিকপ্টারে যাব নাকি ? দুটো বাজে, আর এখন গেলে শুধু ট্রেলার মিস করব ?"। উত্তর আসে, "আরে চ না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে নি। ঠিক আছে বাবা, ভাড়া আমি দেব। একদিন নাহয় ফোকটেই চড়ালাম ..." বলে তিন সঙ্গীকে আড্ডা থেকে খুবলে নিয়ে আবার ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায় সে। আর শিল্পীরই প্রথম চোখে পড়ে যে যাওয়ার সময় ব্যাগটি ফেলে গেছে চেয়ারে। ও সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অন্যরা বলল, "চেপে যা না, মজাটা দেখি, এক্ষুণি আবার দৌড়ে আসবে বাছাধন"। শিল্পী এমনিতেই এতক্ষণ উসখুস করছিল, ভাবছিল কী করে আড্ডা কেটে বেরিয়ে যাওয়া যায়, বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে ? "না না, এইতো বেরোল, এখনো গেট পেরোয়নি বোধহয়, ছুটলে ধরে ফেলা যাবে" বলে ব্যাগটা নিয়ে ছুট লাগল। খানিক যেতেই দেখে গেটের ঠিক মুখটা থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্যান্টিনের দিকে ফিরছে ছেলেটা। "এই যে, নিন আপনার ব্যাগ, চেয়ারেই ফেলে এসেছিলেন ....."

"ওহ, থ্যাঙ্কস এ মিলিয়ন। আমি তো আবার –। তা, প্রণাম-টনাম করবে নাকি ? চটিতে কিন্তু কাদা।"

"মানে ?"

"না, মানে, ওই 'নিন', "ফেলে এসেছিলেন' – ওসব যে যুগের ভাষা তখন তো গুরুজনদের প্রণাম করারও চল ছিল, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

শিল্পী মনে মনে হেসে ফেলে, কিন্তু জবাব দেয় না। ওর নীরবতা দেখে ছেলেটিই বলে, "আমি স্বপ্নিল। ইলেক্ট্রনিক্স। থার্ড ইয়ার। নতুন দেখছি মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ, আমি শিল্পী, ফার্স্ট ইয়ার সাইকোলোজি।"

"এই মেরেছে। সে তো পাগলের কারবার। শিল্পী হয়ে আবার ওসব নিয়ে টানাটানি কেন ? অবশ্য হ্যাঁ, ফ্রয়েড-টয়েড ইত্যাদি সেক্সি ব্যাপারস্যাপারও আছে ...."

ঠিক এই সময় গেটের বাইরে থেকে "কিরে, তুই আসবি ?" বলে প্রবল হাঁক শুনে সে তাড়াতাড়ি "ঠিক আছে, পরে দেখা হবে" বলে এক দৌড়ে গেট পেরিয়ে বাসরাস্তায়। আর সেদিন বাড়ী ফেরার পথে শিল্পীর মনে বারবার শুধু সেই ক্ষণিক-আলাপ ও কথোপকথনের রিপ্লে। তারপর আর কী ? সত্যিই দেখা হল আবার। হতেই থাকল। প্রথমে শুধু ক্যাম্পাসেই, তারপর বাইরেও। অনিয়মিত থেকে নিয়মিত। পারস্পরিক "তুমি" তো সেই প্রথম আলাপের পরেই। সেখান থেকে "তুই"-এ অভ্যস্ত হতেও বিরাট কিছু সময় লাগল না। একজন অধীর অপেক্ষায় থাকে তার পাগল হাওয়ার জন্য। আরেকজন ডুব দিতে চায় দীঘির জলের শান্ত, শীতল গভীরতায়। হাওয়া এসে ঢেউ তোলে দীঘিতে। দীঘির ঘাটে বাঁধা মন-নৌকো উতল হয়ে বলে উঠতে চায় – তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি – আমি ডুবতে রাজি আছি –। কিন্তু দীঘি তার হৃদয়ের অনুভূতি পরম গোপনীয়তার মোড়কে লুকিয়ে রাখে বুকের মাঝে – কাউকে জানতে দেয় না। শুধু হাওয়া জানে।

ওদিকে চারপাশের জগৎ ও জীবন তাদের নিজের নিয়মে গড়িয়ে চলে। স্বপ্নিলের ডিগ্রি শেষ হয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ শুরু হয় সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এক নামকরা কোম্পানীতে। শিল্পীও এসময় স্নাতক পর্যায়ে বেশ ভাল রেজাল্ট করে স্নাতকোত্তর শুরু করল। কিন্তু মানুষের জীবনের চিত্রনাট্য যিনি লেখেন, শুধু তিনিই জানতেন এর পরের সিনে কী হতে চলেছে। স্বপ্নিল ভাবতে পারেনি দুবছর অ্যাপ্রেন্টিস থাকার পরেই বেঙ্গালুরুর উইপ্রো থেকে ইন্টারভিউয়ের ডাক আসবে তার আর তাতে সে সফলও হবে। শিল্পীও কি ঘুণাক্ষরে জানত, যেদিন বেঙ্গালুরুর খবরটা আসবে ঠিক তার পরের দিন ভোররাতেই ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক হবে বাবার ? হাসপাতাল থেকে যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্রায়-অচল শরীরটা ফিরে এল বাড়ীতে, তাকে বাবা বলে কল্পনা করতে চোখ ফেটে জল আসছিল ওর। কিন্তু দীঘির গভীরের সেই তোলপাড় তার জলের উপরিতলকে একটুও কাঁপায়নি। ভাইবোন এখনো সাবালক হয়নি, দিদিকে তাই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে – এটাই বারবার বলছিল সেদিন ও নিজেকে। শুধু একবার বাবার শোওয়ার ঘরের বাইরে এসে অপেক্ষমান স্বপ্নিলের হাতদুটো ধরে বলল, "এই সময়ে তোকে পাশে পাওয়াটা খুব ভাইটাল হতো রে।" চোখ নাবিয়ে স্বপ্নিল মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "সামনের উইকেন্ড অবধি তো আমি আছি। তারপর অবশ্য –। কিন্তু তুই চিন্তা করিস না, আমি সৈকত আর পল্টুকে বলে দিয়ে যাব, তোর কোনোরকম দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে পাবি ওদের। আর দাঁড়া না, ওখানে গিয়ে একটু সেটেল্ড হয়ে নিই, তারপর মেসোমশাইকে আমি ওখানকার ফোর্টিস হাসপাতালে নিয়ে যাব – ওদের ফিজিও-রিহ্যাব সেন্টারটা টপ ক্লাস। ওখানে না হলে মণিপালে তো সিওর।" দমদম থেকে স্বপ্নিলের প্লেন বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে ডানা মেলেছিল যেদিন, শিল্পী যেতে পারেনি বিদায় জানাতে। দুই ভাইবোনের একজন মাধ্যমিক দেবে সামনের বছর, একজন উচ্চমাধ্যমিক। দুজনেরই প্রিটেস্ট পরীক্ষা ছিল সেদিন। অগত্যা মোবাইলেই বিদায় জানাতে হয়েছিল ওকে। ভালই হয়েছিল, কারণ এরপর থেকে তো শুধু ওতেই টুকরো টুকরো ছবি দেখবে স্বপ্নিলের নতুন জীবনের। প্রথমদিকে উৎসাহের আতিশয্যে ওদিক থেকে প্রতিদিন বহুবার করে ফোন, অনেক মেসেজ। তারপর আস্তে আস্তে তার ঘনঘনত্ব কমতে কমতে এখন তো বেশীরভাগ সময় ডাকটা এদিক থেকেই যায়। ঘোষিত কারণ – কাজের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোনো অঘোষিত কারণও আছে কিনা সেটা তো আর শিল্পী দেখতে যাচ্ছেনা। আর আজকাল যেটুকু কথা হয় ওদের মধ্যে, তার বেশীটাই জুড়ে থাকে স্বপ্নিলের অসহিষ্ণু আবদার – "তিন বছর হতে চলল, কবে আসছিস বল তো এখানে কলকাতার পাট চুকিয়ে ? শিমুল-শিশির দুজনেই এখন অ্যাডাল্ট, কলেজে পড়ছে। দে ক্যান টেক কেয়ার অফ দেমসেল্ভস। আর মেসোমশাইয়ের জন্য টুয়েলভ আওয়ার শিফটে আয়া না রেখে ওটা টোয়েন্টিফোর আওয়ার করে দে – ব্যস তাহলেই নিশ্চিন্ত। বলেছি তো খরচ আমি দেব।"

"আর আমার চাকরি ? ওটার কী হবে ?"

"আর ইউ কিডিং মি ? আই মীন, তুই এতো খেটে পড়াশোনা করলি, ডিগ্রি করলি, সারাজীবন একটা মেন্টালি রিটার্ডেডদের স্কুলে জাস্ট দিদিমণি হয়ে থাকার জন্য ? বেঙ্গালুরুতে একবার একটা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের লাইসেন্স পেয়ে গেলে ক্যান ইউ ইমাজিন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইওর ক্যারিয়ার ?"

"জাস্ট দিদিমণি – তাই না ? এই তিন বছরে তুই কেমন যেন বদলে গেছিস নীল – মাঝেমাঝে চিনতে পারিনা তোকে।"

"স্যরি, আমি ঠিক ওটা মীন করিনি, কিন্তু তুই আমাকে বল তো – একটা সাজানোগোছানো সুখী সংসার চাসনা তুই? দুজনে মিলে স্বপ্ন দেখতে চাসনা ? চাসনা মা হতে ? চুপ করে থাকিস না, উত্তর দে।"

"বলেছি তো, সময় এলেই উত্তর পাবি।"

****

নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে ভয় দেখানো, স্পিচ থেরাপির নামে বকাঝকা, দিনকেদিন আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মেন্যুতে ব্যয়সংকোচের চেষ্টা, আবাসিক শিশুরা এসব নিয়ে মা-বাবার কাছে নালিশ করলে তাদের মানসিক নিপীড়ন, কর্মচারীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সত্যিকথাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চাইলে জোর করে তাদের মুখ বন্ধ করা – বোর্ড অফ ট্রাস্টির কাছে একদল অভিভাবকদের তরফ থেকে পেশ করা এই লম্বা অভিযোগতালিকার প্রতিটির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জবাব দেওয়ার ভার ছিল শিল্পীদের কমিটির ওপর। কাগজেকলমে যার নাম স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসাইট কমিটি। অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন, তা প্রমাণের জন্য বিশদ তথ্যসম্বলিত একটা রিপোর্ট তৈরীর কাজটা নিখুঁতভাবেই করেছিল কমিটি, ফলে বোর্ড অফ ট্রাস্টির জরুরী সভায় সেইসব অভিযোগের অধিকাংশই খারিজ হয়ে গেল ধ্বনিভোটে। কিন্তু বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত সেই সভায় কিছু অভিভাবক সরাসরি আঙ্গুল তুলল স্কুলের ডিরেক্টরের দিকে। দাবী করল তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে ডিরেক্টর বেআইনীভাবে আর্থিক অনুদান নিয়ে, অর্থাৎ সোজা কথায় ঘুষ খেয়ে, কিছু অভিভাবককে ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন ভর্তিতালিকার বাইরে গিয়ে। আর তা ঢাকতে স্কুলের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসেবে ব্যাপক কারচুপি করেছেন। অতএব তাদের দাবী ডিরেক্টরকে অবিলম্বে সব সত্যি স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে আর পদত্যাগ করতে হবে। নাহলে অভিযোগকারীরা শুধু সোশ্যাল মিডিয়া আর সংবাদমাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকবেনা, স্কুল কর্তৃপক্ষকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেল যে শিগগিরই আদালতে দেখা হবে। সেদিন বিকেলে স্কুলছুটির পর টুকটাক কিছু কাজ সেরে বাড়ীমুখো হতে একটু দেরী হয়েছিল শিল্পীর। আর সবাই তখন চলে গেছে। হাজিরা খাতায় সই করতে ডিরেক্টরের অফিসে ঢুকে শিল্পী দেখে হুইলচেয়ারের হেডরেস্টে মাথা পিছনে হেলিয়ে, দুহাত দুদিকে ঝুলিয়ে কোণের দিকের টেবিলটায় নিঃশব্দে বসে আছেন দীপ্তেন্দু। চোখের কালো চশমাটা টেবিলে খুলে রাখা। ঘর অন্ধকার। শিল্পী কোনো কথা না বলে নিজের মোবাইলের আলোয় সই করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত গলায় প্রশ্ন, "জানতে ইচ্ছে করে না আপনার ?" একটু বেশী গভীর থেকে উঠে আসছে কি সেই কণ্ঠস্বর ? একটু বিষাদমাখা কি ?

ঘুরে আবার ঘরে ঢোকে শিল্পী, "কী স্যার ?"

– "নাঃ, আপনার কৌতূহল বড়ই কম। নাহলে জিজ্ঞেস করতেন গলা না শুনেই আমি বুঝলাম কী করে যে এটা আপনি।"

– "হ্যাঁ, মানে, আমি ঠিক –"

---"ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমার খুব প্রিয়, জানেন? আজ সকালে মিটিঙে যাওয়ার আগে আপনাকে যখন ডেকে পাঠিয়েছিলাম এঘরে, ওই গন্ধটাই পেয়েছিলাম।"

– "ওঃ, আচ্ছা, আপনি স্যার খুবই –"

– "আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। নাঃ, তার আগে বসুন ওই চেয়ারটা টেনে। খুব তাড়া নেই তো ?" – "না স্যার, ঠিক আছে" বলে বসে শিল্পী। একটু অস্বস্তি নিয়েই, কারণ সন্ধ্যেবেলায় এভাবে একা ডিরেক্টরের সঙ্গে এক ঘরে কখনো কাটায়নি। তাছাড়া আজ দুপুরের সেই অগ্নিগর্ভ মিটিংয়ের পর অফিসে ফিরে আর কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি ভদ্রলোক। দরজা বন্ধ ছিল সারা বিকেল। – "হ্যাঁ, যা বলছিলাম – আচ্ছা, হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছেন আজ দুপুরে মিটিঙে কী হয়েছিল ?"

– "হ্যাঁ, মানে, উনি যতটুকু –"

– "শুনে তো আপনার খুশী হওয়ার কথা। আপনাদের কমিটির পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট জবাবী রিপোর্ট বোর্ড অফ ট্রাস্টির ভোটে জিতে গেছে।"

– "জানি স্যার, কিন্তু শুনলাম ওরা আবার নতুন করে কীসব –"

– "হ্যাঁ। বলেছে। একঘর লোকের সামনে চীৎকার করে বলেছে আমি ঘুষখোর, জালিয়াত। বলেছে আমার প্রকাশ্য অ্যাপোলোজি আর রেজিগ্নেশান চায়। নাহলে এই স্কুলকে ওরা আদালতে দেখে নেবে।"

– "স্যার, এ এমন অলীক, অবাস্তব কথা যে একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ –"

– "গঙ্গা খুব পলিউটেড হয়ে গেছে মিস রায়। সবাই সব মিথ্যে আজকাল গঙ্গায় ডুব দিয়েই বলে তো, তাই।" – "কিন্তু আদালতে এমন জলজ্যান্ত মিথ্যে ওরা প্রমাণ করবে কী করে স্যার ?"

– "সত্যিকে মাটিচাপা দেওয়ার মতো মাটির যে ওদের অভাব নেই। আচ্ছা, গোড়াতেই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন ওরা প্রথমে গার্জেনদের খেপিয়ে, তারপর আমার গায়ে নোংরা ছুঁড়ে এভাবে আমাকে টেনে মাটিতে নামাতে চাইছে ?"

– "কেন স্যার ?"

– "বলি তাহলে, শোনো। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন তুমি আসোনি। এই দ্যাখো – 'তুমি' বলে ফেললাম। কিছু মনে করলে না তো ?"

– " আরে না না স্যার ! এতদিন পর বাঁচালেন একটা অস্বস্তি থেকে। আমাকে 'তুমিই' তো বলবেন।"

– "হ্যাঁ, তুমি তো আমার মেয়ের বয়সী। যাক, যা বলছিলাম, বছর সাত-আট আগে, তখনও আমি ডেপুটি ডিরেক্টর, ডিরেক্টরের জন্য আমার নাম বিবেচনা করার কথা ভাবছে ম্যানেজমেন্ট, আমার কাছে একদিন প্রীতম খৈতান আর হর্ষ মহেশ্বরী বলে দুজন লোক এল। এর অল্প দিন আগেই আমি এখানে ভর্তির জন্য নীড-বেসড সাবসিডি চালু করেছিলাম প্রাইভেট ডোনেশন ফান্ড থেকে। শুনলাম ওরা নাকি দুজনেই তার ডোনার। তা, ওদের আবদার হল, ওরা আমাকে একটা নামের তালিকা সুপারিশ করে পাঠাবে, সেই তালিকার সবাইয়েরই মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান আছে, আমি যেন ওদের বার্ষিক আয়ের বা মোট সম্পত্তির কোনো প্রমাণ ছাড়াই ওদের ছেলেমেয়েদের সাবসিডিতে ভর্তি করে নিই।" – "তারপর স্যার ?" ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে। ফিরতে দেরী দেখে ভাই আর বোনের কাছ থেকে উদ্বিগ্ন টেক্সট আসছে। তাও কথা চালিয়ে যায় শিল্পী। এই মানুষটাকে এরকমভাবে ও আগে কখনো দেখেনি। – "আমি শুনেই বুঝলাম যাদের কথা বলছে তাদের কেউ দুঃস্থ তো নয়ই, বরং গভীর জলের মাছ। তাদের আয়-সম্পত্তির হিসেবে খুব সম্ভবতঃ

কোনো গন্ডগোল আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা সাবসিডিতে স্কুলে ভর্তি আছে এটা দেখিয়ে নিজেদের কাগজেকলমে দুঃস্থ প্রমাণ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব। মুখের ওপর বললাম, ওই প্রস্তাব নিয়ে আর যেন দ্বিতীয়বার এই স্কুলের চৌহদ্দিতে না ঢোকে ওরা। নাহলে কিন্তু ওদের ওই লিস্ট সোজা রাজস্ব আর শুল্ক দপ্তরের হাতে চলে যাবে। ওদের মুখের চেহারা তো আর দেখতে পাইনি, কিন্তু গলার স্বরে বুঝেছিলাম এবার প্রতিশোধের জন্য তৈরী থাকতে হবে।'

– "কী ভয়ংকর ! ওরা কি কিছু –"

– "অনেক কিছু। প্রথমে ডোনার ফান্ড থেকে নিজেদের ডোনেশন উইথড্র করল, তারপর বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে প্রভাব খাটিয়ে আমার ডিরেক্টর হওয়া আটকাতে চেষ্টা করল, তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মিথ্যে মামলা এনে বহুদিন ভোগালো। সে-মামলা লড়তে গিয়ে স্কুলের প্রায় নিঃস্ব হওয়ার জোগাড়। এসবই তোমার আসার আগে। আর এখন গার্জেন্স কাউন্সিলে নিজেদের পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে কী করছে তা তো দেখছই। আমি নিঃসন্দেহ ওরাই পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। মিথ্যে ভয় ওরা দেখায়না। মামলা করবে বলেছে যখন, করবেই। আর মিডিয়ায় স্কুলটার নামে বিষ ছড়াবে। এমনিতেই এবছর আবাসিক কমে যাওয়ায় স্কুলের বাজেটের যা টালমাটাল অবস্থা, লম্বা মামলা চাপলে স্কুলটাই না উঠে যায়। তাছাড়া ওরা যা লোক, মামলায় না হলে হয়তো গুন্ডা লাগিয়ে হামলা করবে।"

– "কী করবেন তাহলে স্যার ?"

– "একটা রাস্তা বার করতে হবে ... একটা রাস্তা বার করতে হবে। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনা – ভেবে পাচ্ছিনা ঠিক কিভাবে – । যে অপরাধ আমি করিনি তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার বা স্বীকারোক্তি দেওয়ার প্রশ্নই উঠছেনা। কতগুলো নর্দমার নোংরা কীটের কাছে মাথা নোয়াতে তো আমি পারব না। আবার আমার জন্য একদল নিষ্পাপ শিশুর কোনো ক্ষতিও হতে দেওয়া যায়না। যাকগে, ওসব নিয়ে ভেবোনা, আমার ওপর ছেড়ে দাও। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল – শিউপ্রসাদকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে নাও।"

– "না না, ট্যাক্সি নিয়ে ব্যস্ত হবেন না স্যার। আমি ঠিক চলে যাব। আপনি এবার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন তো। আর আপনি যতক্ষণ মাথার ওপর ছাতা হয়ে আছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ এই স্কুলের কিচ্ছু করতে পারবে না।"

– "পাকামি কোরোনা তো, যা বলছি শোনো। একটা কথা মনে রেখ – তোমরা, মানে তুমি, তপতী, অনিন্দিতা, সুপর্ণা, পারমিতা, শতরূপা – হলে এখানকার এই গড-ফোর্সেকেন ছেলেমেয়েগুলোর সত্যিকারের মা। বেঁচে থাকার অবলম্বন। বাবা ছাড়াও বাচ্চারা ঠিকঠাক বড় হতে পারে, কিন্তু মা ছাড়া হয়না। আমার বাবা যখন মারা যান আমার বয়স কত জানো ? আট। তারপর মা-ই তো আমায় এতো বড়টি করেছে। এখানকার এই ফুটফুটে বাচ্চাগুলো ভাল করে কথা বলতে পারেনা, পড়তে-লিখতে পারেনা, নিজেদের দেখাশুনো করতে পারেনা, কিন্তু এদের চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ কখনো ? দেখবে একটু ভালোবাসার জন্য কী গভীর আকুতি সেখানে। আর যদি একফোঁটাও ভালবাসা দাও, তার দশগুণ ফিরিয়ে দেয় ওরা। ওদেরও স্বপ্ন দেখতে শেখানো যায়, জানো ? সিরিয়াসলি – আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জীবনের এই এত্তোগুলো বছর ওদের নিয়েই তো ছিল আমার সুখের সংসার।"

– "সত্যি। এই অল্প কবছরে অনেককিছু শিখলাম, অনেককিছু পেলাম আপনার কাছে। আশাকরি আপনার এই মিশন আমরা ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আপনার আস্থার মর্যাদা রাখতে পারব।" চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বলে ওঠে শিল্পী। – "এস তাহলে। তুমিও আজ আমাকে কী দিলে, তুমি নিজেই জানোনা। বুকটা হালকা হওয়া দরকার ছিল আজ রাতে। বড় দরকার ছিল।"

– "গুডনাইট স্যার। কাল রবিবার আর অফিসে আসবেন না। আপনি আজকাল ছুটির দিনেও বড্ডো পরিশ্রম করেন। সোমবার দেখা হচ্ছে তাহলে।"

****

না, সে দেখা আর হয়নি। কারণ মিথ্যের কাছে মাথা না নোয়ানোর অনমনীয় প্রতিজ্ঞা আর নিজের প্রাণাধিক প্রতিষ্ঠানটিকে দুষ্টচক্রের প্রতিশোধস্পৃহা থেকে বাঁচানোর সেই কঠিন সমীকরণের একটিই সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন দীপ্তেন্দু সেন। সোমবার সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় অলকেন্দু বোধ নিকেতনের কর্মচারীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে ঘুমের ওষুধের একটি খালি শিশি খুঁজে পেয়েছিল। আর সহকর্মীদের টেক্সট মেসেজ থেকে খবরটা পাওয়ার পর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে স্কুল কমপাউন্ডে ছুটে যেতে যেতে শিল্পী রায় তার ফিয়াঁসের সম্প্রতি করা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেয়েছিল। তার সুখের সংসার, স্বপ্ন, মাতৃত্ব – কোনোকিছুর ঠিকানাই আর কর্ণাটক নয়। কাঁকুড়গাছি।

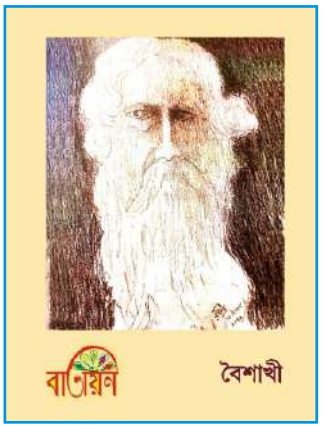

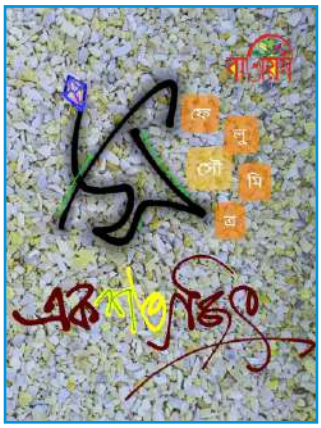

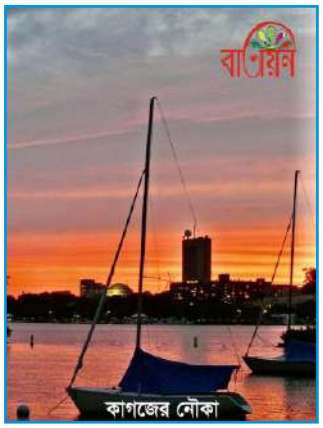

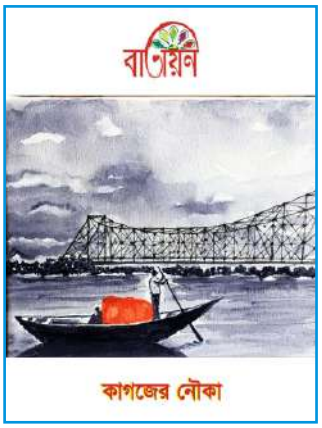

চোখ রাখুন পড়তে থাকুন

www.batayan.org

স্নিগ্ধা সেন

বাণপ্রস্থ

স্ত্রী গত হবার পর থেকে জীবন টা কেমন যেন জোলো হয়ে গিয়েছে হরিশরণবাবুর কাছে। বয়েস কম হল না, অসুখ বিসুখের বালাই পেছু যেন ছাড়তেই চায় না। উনি তাই ঠিক করলেন শেষ কটা দিন একটু আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় কাটাবেন। তার জন্য যা করা উচিত অর্থাৎ ধর্মাচরণ করবেন, সর্বজনে প্রেমভাব বিতরণ করবেন এবং সাধুসঙ্গ করবেন। এই তিনটে সঙ্কল্প করার পেছনেই ওঁর নিজস্ব যুক্তি কাজ করছে। ধর্মাচরণ বলতে উনি দলে বসে নামগান করা নয় একেবারে সাধনা মানে উচ্চমার্গীয় কিছু করবার কথা ভাবছেন। সর্বজনে প্রেমভাবের ব্যাপারটা হরিশরণের মত নির্বিরোধী ভীতু মানুষের পক্ষে কঠিন হবে না কারণ উনি গলা তুলে কথা বলতে পারেন না আর অন্য কেউ খারাপ ব্যবহার করলে প্রতিবাদ জানানো ওঁর ধাতে নেই। ওই অক্ষমতাকে সকলের প্রতি ওঁর ভালবাসা উপচে পড়ছে ভাবলে একটু ভুল হয়ে যাবে। সে যাই হোক.....। আর সাধুসঙ্গ? তার জন্য একটু কাঠখড় পোড়াতে হবে হয়তো। তবে হয়ে যাবে। যার নামই হরিশরণ, তার তো এটাই ভবিতব্য।

তবে ধর্মাচরণের সিদ্ধান্তটা কার্যকর করবার পথ বাধাহীন হল না। হরিশরণ শুনেছিলেন ভাল গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয় এবং নিত্য পুজো, শুদ্ধাচার এ সব মানতে হয় নিয়ম করে। প্রথম কাজ তাহলে দীক্ষাগুরু খুঁজে নেওয়া। মিশন বা আশ্রমে গিয়ে অনেকে দীক্ষা নেন কিন্তু হরিশরণ মানুষটা একটু প্রাইভেট, অনেকের দলে পড়বার বান্দা নন। উনি পারলে হিমালয়ে গিয়ে গুহাবাসী কোন সাধককে খুঁজে বার করবেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী দৈনিক ধর্মাচারের একটি ছক করে ফেলবেন। সে জন্য যদি সহস্রাধিকবার নামজপ করতে হয়, শাকাহারী হতে হয় বছরভর এবং পোশাক আশাক স্বল্পতম করে ফেলতে হয় অর্থাৎ কৌপীনধারী হতে হয় উনি রাজি আছেন। উঁচু পর্যায়ের ধর্মপালনের সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনের একটা যোগ আছে এমনই শুনে এসেছেন বরাবর। চিরকাল যা করেছেন, ভায়রাভাই পতিতপাবনকে মনের কথা জানালেন। দুজনেই কমবেশি স্ত্রীশাসিত (ছিলেন এবং আছেন), তাই সহমর্মী। পতিতপাবন আশ্বাস দিলেন অবিলম্বে কাজে নেমে পড়বেন।

এবং কিছুদিনের মধ্যেই একজন সাধুর সন্ধান এনে ফেললেন। তিনি হিমালয়ে থাকেন ছ' মাস আর বাকি ছ'মাস থাকেন সমতলে। এর মধ্যে দু মাস গড়িয়ায় এক শিষ্যের বাড়ি আর বাকি সময়টা কাটান দেশবিদেশ পরিক্রমায়। যাঁর বিচরণক্ষেত্র এত বিস্তৃত, তাঁর পরিচিতি এবং প্রভাব নিশ্চয়ই অনেক হবে – পতিতপাবনের এমন ধারণা। কিন্তু হরিশরণ চান ওঁর এবং দীক্ষাগুরু যিনি হবেন তাঁর মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকবে – ভক্তশিষ্যের দঙ্গলে উনি স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না। পতিতপাবন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বয়েসে ধর্মকর্মে মতি অনেকের হয়, আপনার তো দেখছি সন্ন্যাসের কোর্সে ঢোকবার ইচ্ছে। ডিগ্রী নিয়ে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করবেন?'

হরিশরণ বুঝলেন একটা খোঁচা, হয়তো নিরীহই, আছে ভায়রাভাইয়ের কথায়। বললেন 'ওপরে গিয়ে পারমানেন্টলি থাকবার জন্য অনুমতিপত্র চেয়ে আবেদন করব ভাবছি। গিয়ে ফিরে এসে ফের জন্ম নিয়ে ঝুটঝামেলায় জড়াতে চাই না ।'

পতিতপাবনবাবু হাসলেন হা হা করে। বললেন, 'ওপরে তো ভাই সবাইকেই যেতে হবে। ফিরে আসব কি আসব না সে তো নিজের হাতে নেই। আপনি আপনার বায়োডেটাতে একটা বাড়তি কোয়ালিফিকেশন দিতে চান, এই তো?' হরিশরণ বাবু স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন।

পতিতপাবন সজ্জন মানুষ, অন্যের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হরিশরণবাবু যোগী সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল এটা বুঝে উনি মহাযোগীদের হদিশে লেগে পড়লেন। কিন্তু কে দেবে হদিশ ? হ্যাঁ, ইন্টারনেট। আজকাল তো সব খবরই নাকি ইন্টারনেটে ঘাঁটলে পাওয়া যায়। ওঁর ভাইপো কম্প্যুটর নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকে, পতিতপাবনবাবু তাকেই গিয়ে ধরলেন।

মহাযোগী ? তাদের কি ওয়েবসাইট থাকে ? ভাইপো জানতে চাইল। আবার নিজেই উত্তর দিল প্রশ্নের – 'যোগ সেন্টারগুলির ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে আর সেই সোর্স ধরে এগোলে হয়তো হিমালয়বাসী যোগীদের খবর পাওয়া যাবে।'

হরিশরণবাবু কোন সোর্সের ধার ধারলেন না। সোজা ফোন করলেন ট্র্যাভেল এজেন্সির কাছে। এই এজেন্সির কথা উনি প্রতিবেশী মানসকুসুম বাবুর কাছে শুনেছেন। মানসকুসুম বাবু গতবছর সপরিবারে সিকিম ঘুরে এসেছেন আর তারপর থেকে 'হিমালয়ের আহা কি শোভা' শুনিয়ে শুনিয়ে হরিশরণবাবুর মনে অদেখা হিমালয় ভূমিতে নিরিবিলিতে বসে সাধনা করবার ইচ্ছাটিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছেন। এজেন্সির ফোন নম্বর মানসকুসুম বাবুই দিয়েছেন। .... ফোনে অপর প্রান্ত থেকে খুব উৎসাহী একটি কণ্ঠ স্বাগত জানিয়ে বলল হরিশরণ বাবু কোথায় যেতে চান জানতে পারলে বেড়ানোর সব রকম সুবন্দোবস্ত করতে এজেন্সি প্রস্তুত। হিমালয় যেতে চাইছেন শুনে জানালো হরিশরণ বাবুর অসীম সৌভাগ্যক্রমে একটি টুরিস্ট দল পুজো'র আগেই হিমালয়ভ্রমণে বার হবে, দু একটি বার্থ এখনো খালি আছে। হরিশরণবাবু শুধু ওঁর কাগজপত্র এবং টাকা নিয়ে এজেন্সির অফিসে একবার যদি আসেন। হরিশরণবাবু জিগ্যেস করলেন হিমালয়ের গুহাগুলো দেখানো হবে তো? গুহা? ও পাশ কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বিনীত জ্ঞাপন, হিমালয়ের অত উঁচু আর ঠাণ্ডা জায়গায় যাবার কোন প্ল্যান ওঁরা করেন নি। হিমালয়ভ্রমণ বলতে উত্তরাখণ্ডের হিল স্টেশন গুলি ভাবা হয়েছে। খাস হিমালয়ে যেতে হলে পর্বতারোহীদের দলে নাম লেখানোই ভালো।

হরিশরণবাবু মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট কে একবার ফোন করে দেখবেন ? ওখানে তো ট্রেণিং নিতে হবে। ওখানে ট্রেণিং, তারপর গুহাবাসের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ – এত সময় হরিশরণবাবুর আর আছে কি? শরীরের কলকব্জার আচরণ যেরকম অনিশ্চিত যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওঁর মুডটা এখন অনেকটা হরি দিন তো গেল'র দিকে হেলে রয়েছে।

মনটা খারাপই হয়ে গেল। তা হলে যাকে বলে নিখাদ ধর্মাচরণ, সদগুরুর নির্দেশে – সেকি তাঁর করা হবে না? পতিতপাবনবাবু অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করে খোঁজ নিচ্ছেন দিচ্ছেন – কাগজ পড়ে, ভাইপোকে ধরে ইন্টারনেট ঘেঁটে, পরিচিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে – কিন্তু হরিশরণবাবু যেমন টি চান তেমন টি ঠিক মেলে না।

শীত এবার জাঁকিয়ে পড়েছে। থাকবে নাকি মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত। পতিতপাবনবাবুর গিন্নি বায়না ধরেছেন গঙ্গাসাগর মেলায় যাবেন। কুম্ভমেলার মত পুণ্যস্থানে যাবার কপাল ওঁর নেই, ... নিদারুণ ভীড়, পায়ের চাপে মরে যাওয়া, দলছুট হয়ে বাড়িতে আর কোনদিন ফিরতে না পারা – এত সব ভয়ের কথা চারদিকে সবাই বলে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ির কাছে যে জায়গা সেখানেই যাওয়া নিরাপদ মনে করছেন। তবে একা নন, পাড়ার বউ ঝি মিলে একেবারে বাস ভাড়া করে যাওয়া হচ্ছে। মহিলাদের গার্জিয়ান হয়ে যাচ্ছে জনাচারেক পাড়ার ছেলে। বেরোলে সাত সতেরো ঝামেলা থাকেই, সে সব পোয়াবে কে পুরুষমানুষ ছাড়া? পতিতপাবনবাবু গিন্নির ইচ্ছেতে আপত্তি কোন দিনই করেননি, এবার ও করলেন না। গঙ্গাসাগর মেলা সম্বন্ধে ওঁর যা ধারণা তাতে লোকের ভীড়ে গিন্নি হারিয়ে যাবার মত দুর্বিপাক ঘটবে এমন উনি মনে করছিলেন না। তবে 'গঙ্গাসাগর' মেলাকে 'কুম্ভ' মেলার ছোট সংস্করণ বলে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখে ওঁর মাথায় একটা ভাবনা চকিতে খেলে গেল। হিমালয় থেকে সাধুসন্ন্যাসী কি এই পুণ্য স্নানে আসবেন ? স্ট্রেইট তুষারগুহা থেকে গঙ্গাসাগরে নেমে আসবেন এমন কোন তপস্বী থাকবেন বলে আশা করা যায় না তবু একবার গিয়ে দেখাই যাক না এবং হরিশরণবাবুকে নিয়েই।

সুতরাং গিন্নি যখন পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন,পতিতপাবনবাবু হরিশরণ বাবুকে তাঁর পরিকল্পনা জানালেন। আলাদাই যাওয়া যাবে এবং গতিবিধি একটু গোপন রাখতে হবে। ওঁদের ওখানে হঠাৎ দেখলে শ্রীমতী পতিতপাবনের মনে পাঁচরকম প্রশ্ন উঠবে, তা ছাড়া অচেনা জায়গাতে ঘরের পুরুষ মানুষ পেলে ঘাড়ে দায়িত্ব এসে পড়াও অসম্ভব নয়। বেচারা হরিশরণের কাজটাই হবে না।

হরিশরণ ব্যাপারটা শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ওঁর মনে হচ্ছিল গুরুর সন্ধান বুঝি পেয়েই গেছেন। ওঁর আগ্রহ দেখে গুরু হয়তো ওখান থেকেই হিমালয়ে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। পতিতপাবন বাবু ব্যাগ গুছিয়ে এসে দেখলেন হরিশরণ বাবু একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলাতে সামান্য দু একটা জিনিস নিয়ে রেডি। এ কি!

হরিশরণ মৃদুস্বরে বললেন, 'মেলা জামা কাপড় নিয়ে কি হবে? সাধুবাবা যদি কৃপা করে শিষ্য করে নেন, আমি আর বাড়ি ফিরব না। ওঁর সঙ্গেই ...।' পতিতপাবন বুঝলেন হরিশরণ ভাবছেন শিষ্যত্ব পেয়েই কৌপীন ধারণ করে হিমালয়ের পথে হাঁটা দেবেন। তবে এ সব জায়গায় কৌপীন পরা চিমটে হাতে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে যাঁরা ঘোরাঘুরি করেন তাঁদের কাউকে গুরু মনে করতে পতিতপাবন পারছেন না। হরিশরণ যেরকম আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন দিনেদিনে উনি যে কখন কি ঘটিয়ে ফেলবেন কে জানে? পতিতপাবন তাড়াতাড়ি বললেন, 'যদি সেরকম কোন গুরু আপনি পেয়েও যান ... মানে যদি তেমন হয় ... মানে এখনও তো পাওয়া যায় নি, বিনা গরম কাপড়জামা এই মাঘের শীতে সাগরে যাবেন ? সর্দি কাশি বা নিউমোনিয়া দূরে রাখবার মত যোগসিদ্ধ তো এখনো হন নি।' ভায়রাভাইয়ের কথায় হরিশরণ একটু দমে গেলেন। উনি তো প্রস্তুত হতে শুরু করেছিলেন। চুলদাড়ি বড়ো রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখে কেমন যেন ছদ্মবেশী সন্ত্রাসবাদী মনে হতে লাগল। পাড়ার সেলুনে গিয়ে একটু ছাঁট দিয়ে আসবার পর আয়নায় ফের দেখলেন, নিজেকে চিনতেই পারলেন না। টিভির সান্ধ্য তর্কাতর্কিতে যে সব রাজনীতি করা মানুষ কে দেখা যায়, চুল ছোট করে ছাঁটা আর বুরুশ দাড়িটা রয়েছে গাল চিবুক ঘিরে, তেমনি দেখাচ্ছে ওঁকে।

যাওয়ার দিন এসে গেল। মেয়েরা তো বাসে রওনা হয়ে গিয়েছেন, এই দুজন যাবেন ট্রেনে, তারপর খানিকটা অটো, খানিকটা লঞ্চ – ঝামেলা অনেক। কিন্তু হরিশরণ হিমালয়বাসী সাধুর সঙ্গ পেতে আকুল, পতিতপাবন ভায়রাভাইয়ের জন্য অসাধ্যসাধন করতে ব্যাকুল – ঠেকেঠুকে পৌঁছে গেলেন মেলাভূমিতে – স্নানের একদিন আগেই।

সাগরের কাছে না পাওয়া গেল ঝুপড়িতে ঠাঁই, না কোন তাঁবুতে জায়গা। লোক যেন একেবারে উপচে পড়ছে। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে এলাকা থেকে দূরে হোটেলে আস্তানা মেলে কিনা খবর নিচ্ছেন। মহা মুশকিল। পতিতপাবন বললেন, 'আগে মাথা গোঁজার জায়গা মিলুক, তারপর সাধুর সন্ধান করা যাবে।' হরিশরণ খুব ক্ষুধার্ত বোধ করছিলেন, পরিশ্রান্তও ছিলেন তবু মনেমনে নিজেকে তিরস্কার করলেন-ছিঃ, এইটুকু শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না যেখানে সাধু যোগীরা ইন্দ্রিয়নিবৃত্তির সাধনা করেন কতরকম কষ্টসাধ্য সংযম অভ্যেস করে। যাই হোক, পতিতপাবন এ সব উচ্চ চিন্তা করছিলেন না। উনি দৌড়োদৌড়ি করে খবরাখবর নিয়ে কাছের একটা হোটেলে গেলেন প্রথমে। হোটেলে থাকবার জায়গা নেই তবে ভাগ্যক্রমে পেছনে একটা ঘেরা জায়গামত করা রয়েছে। একটা টিউবওয়েল আছে পাশেই, জল তাতে প্রায় ওঠেই না – কষ্টেসৃষ্টে হাতমুখ ধোয়া গেল। ঘেরা জায়গাটার মধ্যে একটা পাইপ এনে রাখা আছে, কোথায় তার কানেকশন হোটেলওয়ালাই জানে। সকালে দু ঘন্টা দুপুরে দু ঘন্টা জল পাবার কথা, মেলার যাত্রীরা লাইন দিয়ে স্নান সারছেন। একটু ঠেলাঠেলিও হচ্ছে। হোটেলের গায়ে লাগানো যে শৌচাগার, সরকারী উদ্যোগে তৈরী, সেটিতে জল ব্যবহার করতে হয় বাইরের ড্রাম থেকে জল নিয়ে।

শুচিতা রক্ষা মাথায় রেখে ওই হোটেলেই ডাল ভাত ঘ্যাঁট খেয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করা গেল। তার পর শুরু হল সাধুসন্ধান। বাঙালি অবাঙালি অজস্র তীর্থযাত্রী। বিভিন্ন বয়েসের মহিলাদের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়বার মত। পতিতপাবন ভয় পাচ্ছিলেন এই বুঝি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওঁদের এমন চুপিচুপি আসা মানে বাড়ি অরক্ষিত রয়েছে এবং চোর ডাকাত সব এতক্ষণে সাফ করে দিয়েছে – এ জাতীয় তিরস্কার এবং বিলাপ পতিতগিন্নী করতে থাকবেন সরবে।

হায় রে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। একটা চালুনি না ঝুড়ির দোকানের সামনে একটা ছোট্ট জটলার মধ্যি থেকে পতিতগিন্নী বেরিয়ে এসে হরিশরণের হাত চেপে ধরলেন ।

'একী, আপনারা, এখানে ?' পতিতপাবন গিন্নীর গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকিয়েছেন।

'শোন শোন, হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম বলে ... জানাবো কি করে ? দাদা একটু সাধুসঙ্গ করতে চান ... মেলায় তো সাধুরা আসবেন, তাই ...। তোমরা জানো কোনদিকে সাধুরা আছেন ?

পতিতপাবনের গিন্নী খরখর করে বললেন, 'সংসার ত্যাগের ইচ্ছে হয়েছে জামাইবাবুর না তোমার ? খোলাখুলি বললেই তো হয়।'

'না না ব্যাপারটা দাদার। একা একা থাকেন। ভাবছেন শেষ বয়েসে সাধুসঙ্গ করবেন ... আমার তো উচিত –'

'ওঁর সংসার ত্যাগের ব্যবস্থা করে দেওয়া, তাই তো ? যদি বিয়ে করতে চাইতেন, কনে খুঁজে দিতে এই মেলার ভীড় থেকে। ভাগ্যিস দিদি চোখ বুজেছে সময়মত। এ সব ক্ষ্যাপামি সইতে হয় নি ।'

হরিশরণ ভারি সংকোচ বোধ করছিলেন এই সোচ্চার পারিবারিক আলাপের মাঝে পড়ে। মনে হচ্ছিল গর্হিত কিছু করতে গিয়ে ওঁরা দুজন ধরা পড়ে গিয়েছেন।

পতিতপাবন তাড়াতাড়ি বললেন, 'তোমরা তো আমাদের আগে এসেছ। সাধুদের জন্য ব্যবস্থা কোনদিকে করা হয়েছে ?'

'ঘাটের কাছাকাছি একটা বড় তাঁবুতে আছেন শুনছি।' পতিতগিন্নী ওঁর নারীবাহিনীকে নিয়ে চলে গেলেন। পুণ্যস্নানে এসে ঝগড়াঝাঁটি করা মানায় না।

হরিশরণের মন চনমন করে উঠল। অবশেষে পাওয়া গেল একটা হদিশ।

ওই তাঁবুর চারপাশে পুলিশ। কড়া পাহারা। ঢোকা সহজ হবে না। হরিশরণ আর পতিতপাবনের বয়েস দেখে পুলিশদলের কর্তা বললেন, 'কার সঙ্গে দেখা করবেন ? এঁরা হৃষীকেশ থেকে এসেছেন।' 'নাম জানি না।' কাঁচুমাচু হয়ে বললেন হরিশরণ।

'এত পুলিশি কড়াকড়ি কেন ? খুব বিখ্যাত কেউ এসেছেন এঁদের সঙ্গে ?'

পতিতপাবনের প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ অফিসার বললেন, 'বাঃ, চারদিকে কি ঘটছে দেখছেন না? এমন একটা ভিড়ে বড় কিছু ঘটানোর জন্য ঘুরছে টেররিস্টরা আর হয় তো সাধুদের তাঁবুকেই শেল্টার করে রয়েছে।' হরিশরণ মিনমিন করে জানতে চাইলেন হিমালয়বাসী সাধুদের সঙ্গে টেররিস্টদের যোগাযোগ থাকবার কি কারণ থাকতে পারে? 'কি বলেন স্যার, হিমালয় অঞ্চলেই তো টেররিস্টরা আত্মগোপন করে আছে আর ও দিকে বর্ডার থাকাতে অস্ত্র শস্ত্র – বুঝলেন না ?'

'সাধুসন্ন্যাসীদের মাঝে এরা কি ...?'

'সাধুসন্ন্যাসী সেজেই থাকে। এই যে এখানে এত গেরুয়াধারী, তার মধ্যে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা এখনো জানতে পারি নি।'

এ সব কথা চলতে চলতে হরিশরণের চোখ পড়েছে তাঁবুর সামনে এক টুকরো খোলা জমির উপর। তিন চারজন সাধু যোগাভ্যাস করছেন-নানা রকম আসনে রয়েছেন তাঁরা । বলে উঠলেন, 'ওই যে ওখানে যাঁরা ওঁদের কারুর সঙ্গে...।'

অফিসার চোখ কুঁচকে বললেন, 'ওঁরা তো বড় সাধুদের অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রুপ। ঠিক আছে কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে, একজন যাবেন কিন্তু।'

সাধুদের এলাকায় যে কেউ ঢুকতে পারে না। পুলিশ গিয়ে খবর দেওয়াতে ভেতর থেকে একটি অল্পবয়স্ক সাধু বেরিয়ে এলেন। হরিশরণ 'সংরক্ষিত এলাকা'র ধারে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আলাপ শুরু হতেই বোঝা গেল সাধু হিন্দিভাষী। হরিশরণ আবার হিন্দী তেমন ভাল করে বলতে পারেন না। সাধু বেশ স্মার্ট, পোশাক আশাকে, চলনে বলনে সবেতেই। গেরুয়া সিল্কের হাত লম্বা কুরতা, সিল্কের লুঙ্গি, একটা গেরুয়া গরম চাদর গায়ে জড়ানো গায়ে। হরিশরণ লক্ষ্য করেছেন চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা আর হাতে দামী ঘড়ি ও আছে। হিন্দী'র বদলে ইংরেজি বলবেন হরিশরণ? না না, এঁরা হয়তো সংস্কৃতের বদলে হিন্দী বলেন লোকের বুঝবার সুবিধে হবে বলে। ম্লেচ্ছ ভাষা বলাটা ঠিক হবে না।

'ইনস্পেক্টর সাব আপকে সাথ বাত করনে কেলিয়ে মুঝে বুলায়েঁ। পুছনা ক্যা হ্যায় আপকো ?' হরিশরণ ঝুঁকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনারা মানে হিমালয়সে আয়া সুনকে ভেজ করনে এসেছি। আমি চা তা হ্যায় হিমালয় যা কে সাধনা করার শিক্ষা নিতে।' হিন্দীতে কুলোচ্ছে না আর।

'হিমালয়? উতনা উঁচা পাহাড়পর ? কিস লিয়ে ? নহি নহি, হমারে লিয়ে এন আর আই শিষ্যলোগোঁনে বিল্ডিং বনায়া, বহোত বড়া।'

'সাধনা করনে কেলিয়ে গুহা লাগতা না ?' .....

'গুহা ? ক্যায়সে রহেগা উসমে ? আইস কভারড গুহাকি অন্দর ব্যয়ঠকে কোই সাধনা কর সকেগা কনসেনট্রেট করকে ?' হরিশরণ খুব অবাক হলেন। তবে ? যোগীপুরুষদের কথা এত শুনেছেন এতদিন ধরে ! 'সাধুজী আমি যোগশিক্ষা করব ভেবেছিলাম।' 'ইয়োগা ক্লাস চলতা রেগুলার। আপ হৃষীকেশ আ জাইয়ে, ইয়োগা ক্লাসমে অ্যাডমিশন হো জায়গা। আপ স্মার্ট ফোন মে অ্যাপ ডাউনলোড করকে ভি এনরোল কর সকতে' হরিশরণকে হতভম্ব হতে দেখে সাধুজী বললেন, 'আপ ক্যা কলকাত্তামে রহতেঁ হ্যায়? তব তো আপকো হমারা আশ্রমকা গেস্ট হাউসমে কুছ দিনোঁ কে লিয়ে ঠেহরনা পড়েগা। কোই প্রব্লেম নহী হোগা। ঘর ঘরমে রুম হিটার হ্যায়, গরম পানি ভি মিলেগা।'

এই সাধু কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপারই নেই উনি যা বলছেন তাতে। হরিশরণ চুপ করে আছেন দেখে সাধুজী ভাবলেন আরও কিছু বোধহয় জানতে চান ইনি। হরিশরণের তো সত্যি অনেক প্রশ্ন। সাধনা করার ব্যাপারে কিছুই কথা হল না, হিমালয়ে এঁদের চলাচলই নেই, যোগ শিখতে হবে ক্লাস করে ... সব কেমন যেন যা ভাবা হয়েছিল তার বিপরীত। সাধুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপকে পাস কম্প্যুটর হ্যায়? পাঁচ ডিভিডি কা এক সেট ইধারসে লে যাইয়ে, ইয়োগাকা পুরা ইন্সট্রাকশন উইথ ডেমন্সট্রেশন হ্যায় ইসমে। ঘর জাকে আরামসে দেখেঙ্গে অফর প্র্যাকটিস করেঙ্গে।' 'আমার কম্প্যুটর নেই।' 'আজব বাত। আপ ক্যা ঘরমে একেলে রহতেঁ হ্যায়? আজকাল তো ছোটা লড়কা ভি কম্প্যুটর স্যাভি হোতা। ফোন পে স্কাইপ ডাউনলোড কর লিজিয়ে। উসমে আপ লেকচারস ভি সুন পায়েঙ্গে।' হরিশরণকে ওঁদের ফোন নম্বর ওয়েবসাইট সব লেখা একটা কাগজ আনিয়ে দিলেন ভেতর থেকে। হরিশরণ বাধ্য ছাত্রের মত সবেতে মাথা নেড়ে চলে এলেন।

বাইরে এসে হরিশরণ পতিতপাবনকে দেখতে পেলেন না। সেই পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এসেছেন ওঁকে দেখে। 'দেখলেন কাউকে? ভেতরে সব ঠিক ঠাক ?' হরিশরণকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিলেন নাকি উনি? হরিশরণের ভুরুতে ভাঁজ পড়বার আগেই বিশদ হলেন অফিসার – 'মানে সন্দেহজনক কাউকে দেখলেন ভেতরে?' 'আমি তো যোগসাধনার গুরু পাবো ভেবে দেখা করতে চেয়েছিলাম। সন্দেহ করবার মত কেউ কেন ..... ?' 'এ ভাবেই গুপ্ত কাজকর্ম চলে মশাই। টেররিস্টরা কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে আপনি জানবেনও না। আমি শুধু কি তদারকি করছি? সেই সঙ্গে নজরদারিও চালাতে হচ্ছে।'

এরমধ্যে দেখা গেল পতিতপাবন আসছেন, সঙ্গে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা। হরিশরণের দিকে 'কাজ হল' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েই মহিলাকে নিয়ে পুলিশ অফিসারের দিকে ফিরলেন। জানা গেল এই মহিলার ছেলে বছর তিনেক হল ঘর ছেড়েছে ভবঘুরে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প নিয়ে। মা আসেন এই গঙ্গাসাগর মেলাতে ছেলের দেখা পেয়ে যেতে পারেন এই আশায়। গত দু বছরেও এসেছিলেন। শরীর খারাপ হচ্ছে, ভয় ছেলেকে আর দেখতে পাবেন না। এদিকে সাধুদের তাঁবু পড়েছে শুনে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে আসছিলেন। পতিতপাবন শুনে নিয়ে এসেছেন ওঁকে। হরিশরণ মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। পতিতপাবন যেন বিপত্তারণের ভূমিকার জন্য সদাই বুক্‌ড। হরিশরণ কোথায় নিজের মনোব্যথা ভায়রাভাইকে জানাবেন না উনি আর একজনের সমস্যা সমাধানের কন্ট্র্যাক্ট নিয়ে বসে আছেন।

ভদ্রমহিলা যথেষ্ট আত্মনির্ভরশীল মনে হল। নিজের কথা নিজেই বলবেন বলে পতিতপাবনকে একটা নমস্কার জানিয়ে পুলিশ অফিসারের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। হরিশরণ হাত ধরে পতিতপাবনকে টেনে আনলেন। পতিতপাবন একটু ক্ষুণ্ন হয়েছেন। পরোপকারের এই প্রকল্পটা সম্পূর্ণ করা গেল না। হারানো ছেলেটিকে বাড়ি ফিরিয়ে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারলে ওঁর মন শান্ত হত।

হরিশরণ ঠিক মুডে ছিলেন না, সাধুর সঙ্গে কথা চালাতে ভারি স্ট্রেইন হয়েছে। একটু রাগের গলায় বললেন। 'আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে কোন মাঠে চরতে গিয়েছিলে ?' পতিতপাবন এই ভাষা শুনে বলতে যাচ্ছিলেন, 'এ কি দাদা', ... তার আগেই হরিশরণের বিস্ফোরণ, 'কোথায় আনলে ভাই, এ তো গেস্ট হাউসের টাউট আর কম্প্যুটরের সেলস ম্যানের তাঁবু।' 'চুপ করুন দাদা, লোকে শুনবে। গুরু'র খবর পাননি এখানে ?' হরিশরণ তাঁর অভিজ্ঞতা জানালে পতিতপাবন প্রশ্ন করলেন, 'তা এবার কি করবেন ? কম্প্যুটর ক্লাসে ভর্তি হবেন ?' আমার আর ক'টা দিন বাঁচা বল ? এখন এত সব নতুন জিনিস শেখার সময় আছে ?'

পতিতপাবনের কি মনে হল, বললেন, 'এই মহিলার ছেলেকে পাওয়া গেলে আপনার হিমালয় সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতেন। অবশ্য যদি সে আদপেই সাধু হয়ে থাকে।'

'মানে ? তুমিও পুলিশের মত ভাবছ যে টেররিস্টরা সাধু সেজে নেচে বেড়াচ্ছে ?'

'না, হঠাৎ সাধু হবার ইচ্ছে – প্রেমে পড়লে টড়লে... ।'

হরিশরণের আহত মুখভাব দেখে পতিতপাবন তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'মানে ছেলেমানুষ তো – ওর বৈরাগ্য ভাব আসবে কেন ?'

হরিশরণের সন্দেহ হল পতিতপাবন পরোক্ষে ওঁর সাধুসংকল্পের পেছনে কোন বয়স অনুচিত মনোবৈকল্যের অনুমান করছেন। কি অন্যায় ! বরঞ্চ পতিতপাবন এক অপরিচিত মহিলাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি রকম ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন। দেখতেন ওঁর গিন্নী এ সমস্ত, তখন জারিজুরি বেরিয়ে যেত।

ভাগ্যের এমন পরিহাস যে সেই পতিতগিন্নিরই শরণ নিতে হল ওঁদের দুজনকে রাতের আশ্রয়ের জন্য। কাল স্নান আর লোকের আসার বিরাম নেই এখনও। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। এই শীতে বাইরে রাত কাটাতে হলে হরিশরণ আর পতিতপাবনের কালকের থাকবার জায়গা হবে হাসপাতালের বেডে।পতিতপাবন কিন্তু কিন্তু করে ভায়রাভাইকে বললেন, 'মেয়েরা যখন একটা তাঁবু ভাড়া নিয়েছে, ওখানেই যাই।' 'মেয়েদের সঙ্গে থাকব কি করে?' 'কেন, পাড়ার ছেলেরাও তো আছে ওখানে, জায়গা হয়ে যাবে।'

তাঁবুটা এখন খুঁজে পেতে হবে। অনুসন্ধান অফিসে গেলে সুরাহা হবে ভেবে সেখানেই যাওয়া হল। কিন্তু কার নাম করে তাঁবু ভাড়া হয়েছে তাই তো জানা নেই, কি করে বলা যাবে ঠিক কত নম্বর তাঁবু ? শেষে হারানো আত্মীয়ের খোঁজ

চাই এমন ঘোষণা করা হল। মিনিট পনেরো পর পাড়ার দুটি ছেলে এসে দাঁড়ালো। একটু বিস্মিত। চেহারা দেখে তেমনই মনে হচ্ছে। কে হারিয়ে গেছে বলে ঘোষণা ? মাসিমা কাকিমারা সবাই খুব অবাক হয়েছেন। পতিতপাবন ওদের এক পাশে ডেকে যখন ব্যাখ্যা করলেন কি অসুবিধেয় পড়েছেন ওঁরা দু জন ওরা বলল তাঁবু তো বেশ বড়ো, জায়গা অকুলান হবে না। তবে বাড়তি বিছানা নেই। হরিশরণ বললেন, 'আমরা না হয় আগুন জ্বালিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব।' 'কি বলছেন ?' পতিতপাবন ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'ধুনি জ্বালিয়ে সাধুদের মত বসে থাকবেন? কম্বল এখানে কোথাও ভাড়া পাওয়া যাবে নিশ্চয়।'

অনুসন্ধান আপিশ জানালো এতো ভিড় হয়েছে এবার যে কম্বলের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তবে বয়স্ক মানুষ চাইছেন – চেষ্টা চরিত্র করে দুটো খসখসে কিন্তু বড় কম্বল পাওয়া গেল। একটা শোবার জন্য, অন্যটা গায়ে দেওয়ার কাজ হবে। হরিশরণের আর বলবার সাহস নেই যে ওঁর ঈপ্সিত সাধুজীবনে এমন কষ্টই করা বিধেয়। ওঁর সংকল্পগুলি সম্বন্ধে আগে পতিতপাবনের প্রশ্রয়ের মনোভাব থাকলেও এখন হাবেভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে এরকম অবাস্তব ইচ্ছের জন্য যত ঝামেলাতে পড়তে হচ্ছে।

পতিতপাবন আর হরিশরণ কম্বল নিয়ে তাঁবুতে ঢোকা মাত্র পতিতগিন্নী যে অভ্যর্থনা জানালেন ছিটকে বেরিয়ে আসাই ভদ্রসন্তানদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ঠেলার নাম বাবাজী।এবার হরিশরণ নীচু গলায় বললেন একেবারে কোনো ব্যবস্থা না করে এসে পড়েছেন এই মেলায়, খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। তবু পাড়ার লোকদের পেয়েছেন এটুকু রক্ষে।

হরিশরণের শ্যালিকা মুখে যাই বলুন মনে অতটা নির্দয় ছিলেন না। পরদিন ভোরেই স্নানের শুভ মুহূর্ত, তাই মেয়েরা শুদ্ধাহারে ছিলেন। তবে হরিশরণদের জন্য গরম রুটি তরকারী জুটে গেল। পরদিন সকালে যখন ওঁদের ঘুম ভাঙলো তখন তাঁবু খালি। স্নানার্থীদের মিলিত কলরব শোনা যাচ্ছে একটু দূর থেকে। মেলাচত্বরে জনসাধারণের জন্য কয়েকটা অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে স্নান কৃত্যাদি সারার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর সেটা কাল পতিতপাবনের নজরে পড়েছিল। উনি তেমন একটি জায়গার সন্ধানে বেরোলেন। হরিশরণ বেরিয়ে এদিক ওদিক খুঁজলেন এক কাপ গরম চা যদি পাওয়া যায়। বেশ ঠান্ডা। হঠাৎ দুটো তাঁবু ছাড়িয়ে ওঁর চোখে পড়ল কালকের মহিলাটি দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করছেন। উনি স্নানে যান নি ?

হরিশরণ কি এক টানে এই মহিলাটির দিকে দু পা এগিয়ে গেলেন। উনি ও মুখ ফিরিয়ে হরিশরণ কে দেখে পরিচিতজ্ঞানে হাসলেন, নমস্কার ও করলেন। হরিশরণ আর একটু এগোলেন, গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি গেলেন না স্নান করতে ?' মহিলা ম্লান হাসলেন – 'আমি তো স্নানের উদ্দেশ্যে এখানে আসি নি।' হরিশরণ সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'আমি শুনেছি যে আপনি আপনার ছেলের সন্ধান করছেন। এত অল্প বয়েসে সে গৃহত্যাগ করল সেটা আপনার বেদনার কারণ তো বটেই।' হরিশরণ কি বেশি কথা বলে ফেলছেন ? ভাষা সাজিয়ে বেশ সচেতন ভাবে ? মহিলা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই ওর একটু সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ পছন্দ। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বই জোগাড় করে পড়ত। হঠাৎ বাই উঠলো সন্ন্যাস নিল এমন নয়।' বাই এর কথা শুনে হরিশরণ একটু কুঁকড়িয়ে গেলেন। ওঁর সম্বন্ধে লোকে তো তাই ভাবে।

পতিতপাবন ফিরে আসছেন। হরিশরণকে নিয়ে আবার যাবেন স্নান মুখধোয়া ইত্যাদির জায়গায়। এখানে হরিশরণকে মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে দেখে থমকিয়ে গেলেন। তারপর একটু নরম গলায় বললেন, 'দিদি, স্নান করলেন না আপনি ? ভাল লাগত, অত লোক একসঙ্গে জলে নেমেছেন।' হরিশরণ নিজের স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে একটু কড়া গলায় ভায়রাভাইকে বললেন, 'আহা ওঁর ইচ্ছে হয় নি যাননি। চল আমাদের কোথায় যেতে হবে।' আসলে ভাবলেন পতিতপাবনের যেমন অভ্যেস – বাড়াবাড়ি রকম উপকারের আগ্রহে ভদ্রমহিলাকে অকারণ বিরক্ত করে ফেলবেন।

মনে মনে বিচলিত হয়ে রয়েছেন হরিশরণ। ওঁর সাধ সংকল্প কিছুই পূর্ণ তো হলই না, উপরন্তু ব্যাপারটা হালকা হয়ে যাচ্ছে সকলের চোখে। পতিতপাবনের গিন্নী পুণ্যস্নান করে ভারি খুশী, তার উপর স্বামীকে পেয়েছেন, কাজকর্ম করিয়ে নিচ্ছেন ইচ্ছে মত। পুরস্কার হিসেবে হরিশরণদের বাসেও জায়গা হয়ে গেল।

বাসে বসে পতিতপাবন বললেন, 'একেবারে নিষ্ফল গেল না যাত্রা বলুন।' 'কি বলছ ভাই, ওই সব কম্প্যুটর নিয়ে আমি সাধনা করা শিখব ? ওখানে তো গুরুই দেখতে পেলাম না। আপিস আপিস ভাব।' 'আপনার যেমন পছন্দ তেমন গুরুর সন্ধান আপনাকে ..... সেই মহিলার ছেলেকে যদি পাওয়া যেত ...।' 'রসিকতা কোরো না।' 'না, এটা তো ঠিক যে কিছু নির্ভর করবার মত খবর হয়তো পাওয়া যেত।' হরিশরণ বললেন, 'এ সব বলার কি মানে ? সেই মহিলার ছেলে কোথায় আছে, ফেরার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, মহিলা কোথায় থাকেন, কে ই বা উনি কিছু না জেনে .....।' পতিতপাবন মুচকি হাসলেন। হরিশরণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তা দেখছিলেন, ভায়রাভাইয়ের হাসি দেখতে পাননি।

পতিতপাবনের হাসির একটা কারণ ছিল। পতিতগিন্নী আলাপী মানুষ। উনি এসে আশপাশের তাঁবুতে যাঁরা ছিলেন, মানে মহিলারা, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছিলেন। পতিতপাবনের কাছে ছেলের খোঁজে আসা মহিলাটির কথা শুনে উনি বলেছিলেন, 'উনি তো দাদার ছোট নাতনী রুনির স্কুলে যোগ ব্যায়াম শেখাতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। বাড়িতেও যোগব্যায়ামের ক্লাস করেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কোলকাতায় ফিরে একদিন ওঁর বাড়ি যাব। বছরভর ব্যথা বেদনায় ভুগি, একটু যোগ শিখলে ভালই হবে।' সর্বনাশ। হরিশরণ আর ওঁর গিন্নি দুজনেই যোগ চর্চা করতে আরম্ভ করলে পতিতপাবনকেই সন্ন্যাস নিতে হবে।

কোলকাতায় ফেরবার পর হরিশরণ গুরু সম্বন্ধে আকুলতা আর তেমন দেখাচ্ছেন না দেখে পতিতপাবন একদিন বলেই ফেললেন, 'দাদা মন কি ঘুরে গেল?' 'মানে?' 'মানে বৈরাগ্যভাব কি একটু দুর্বল হল?' এর কি উত্তর দেবেন হরিশরণ? ইচ্ছে হয়েছিল সংসার থেকে অবসর নেবেন কিন্তু ভাগ্য সাহায্য করছে না।

পতিতপাবন মানুষটি কারুকে নিয়ে বিদ্রুপ করেন না, – হরিশরণের সন্ন্যাসগ্রহণের পরিকল্পনা যে বাস্তবে রূপ নেবে না সেটা বুঝেও উনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এখনও। নানা রকম যুক্তিকথায় উনি হরিশরণকে বোঝাতে চাইলেন যে এই বয়েসে হিমালয়ের গুহাটুহা বিলিতি অ্যাডভেঞ্চার এর ছায়াছবিতে দেখাই ভাল । আর সাধনা করবার কোন সহজ পাঠ যদি থাকে সেটিকে অনুসরণ করা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে। শরীরে যেমন সইবে আর কি।

গঙ্গাসাগরের ধকলে দুজনেই যে কাবু হয়েছেন তার প্রমাণ ফিরে এসে সর্দি কাশি জ্বরে পড়েছিলেন কেবল ওঁরা, পাড়ার অন্য কেউ নয়। পতিতগিন্নি অবশ্য বাক্যদাওয়াই এর সঙ্গে সঙ্গে কোবিরাজী পাঁচন খাইয়ে দুজনকে খাড়া করে তুলেছেন ।

পাড়ার সরস্বতী পুজোর পুরো দায়িত্ব পাড়ার মেয়েরাই প্রতি বছর নেন। এ বছর তার ব্যতিক্রম হয় নি। পরিচালিকা সমিতির নেত্রী পতিতগিন্নি, দাপটে সব সামলাচ্ছেন। বড়ো করে খিচুড়ি ভোগ হচ্ছে, পাড়ার সবাই – তাদের বন্ধুবান্ধবও আছে – একসঙ্গে বসে হই হই করে খাবে সে আনন্দেই মশগুল। হরিশরণ ভাজাভুজি ইত্যাদিতে গুরুভোজন হয়ে যাবে কিনা ভেবে সংশয়ে ছিলেন কিন্তু এসে গেল এত্তেলা আর বার্তাবাহক হয়ে এলেন পতিতপাবন।

খিচুড়ি স্পটে পৌঁছে হরিশরণ রীতিমত অবাক। সেই মহিলা এসেছেন। পতিত গিন্নির গেস্ট হিসেবে স্পেশ্যাল নেমন্তন্ন পেয়েছেন। ওঁর সঙ্গে হরিশরণের আলাপ করালেন পতিতগিন্নি, আবার আগেই পরিচয় হয়েছে শুনে নকল বিস্ময়প্রকাশ ও করলেন। এটুকু অ্যাকটিং পতিত গিন্নি জেনেশুনেই করলেন। তারপর কি যেন জরুরী কাজ আছে বলে পতিতপাবন কে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ওখান থেকে।

হরিশরণ মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা কি ভাবে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মহিলা নিজেই বললেন, 'আপনার বাড়ির লোকজন আসেননি?'

'আমার বাড়িতে আমি একাই।'

'আমারই মত। তবে ছেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি সম্প্রতি।' 'বাঃ, খুব ভাল খবর, কোথায় আছে এষন ?'

'উত্তর ভারতে একটা হিল স্টেশনে এখন রয়েছে। এটা হল সাময়িক ঠেক। আবার বেরিয়ে অন্য কোথাও যাবে ক'দিনের মধ্যেই।'

হরিশরণ বললেন, 'আপনি অনুযোগ করলেন না এতদিন খবর না দিয়ে আপনাকে কতখানি দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল ?'

'আমার অনুযোগের ধার ধারে ও ? বলছে সব ছেড়ে বার হয়ে এসেছি – খবর দেওয়া মানে তো সংযোগ রাখা। তা আর হয় না মা।... তারপর কি বলল জানেন ? ও জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর ... পাহাড়ের কোলে আশ্রম, নিরিবিলি পরিবেশ। আমি চাইলে বেড়াতে যেতে পারি। এখন গেলে ওকে পেতেও পারি।' একটু থেমে বললেন, 'দয়া করল মাকে।'

হরিশরণের মনে অনেক বাজনা একসঙ্গে বাজছে। 'হিমালয়ের কাছে আশ্রম?'

'তাই তো লিখেছে। যেতে খুব ইচ্ছে করছে। জানেন ও সব জায়গায় গেলে আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছে করেনা। হিমালয়ের কাছে যাওয়া মানে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে সব ব্যবস্থা কি করে করব?'

'আমার চেনা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে।' কথাগুলো হরিশরণ বললেন? কোন ট্র্যাভেল এজেন্সি'র কথা ভাবছেন উনি ? যাদের সঙ্গে একবার মাত্র ফোনে কথা বলেছেন ? তাও মানসমুকুল এর কাছে ফোন নম্বর পেয়েছিলেন বলে। কিন্তু উনি বলে যাচ্ছেন, কথাগুলো বলতে ওঁর ইচ্ছে করছে। 'এই এজেন্সি টিকিট বুক করে দেবে। আরলিয়েস্ট যেমন পাবে। বলব ?'

'একা তো অনেক ঘুরেছি আগে। এখন বয়েস হয়েছে, দৌড়ঝাঁপ করতে ক্লান্ত লাগে। এজেন্সি টিকেট জোগাড় করে দিলে খুব ভাল হয়। আপনি চলুন না আমার সঙ্গে। পেছুটান তো নেই। জায়গাটা সুন্দর বলছে।'

'আমার তো অনেকদিন থেকে অমন জায়গায় যাবার ইচ্ছে। ভাল লাগলে ক'দিন থেকেও যেতে পারি। যদি বাইরের লোক মানে অদীক্ষিত কাউকে থাকতে ওঁরা অ্যালাউ করেন ।'

'অতিথিনিবাস আছে শুনলাম। না হলে হোটেল আছে।'

পতিতপাবন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে এলে যে ?'

'আহা, ওঁরা দুজন করুন না গল্প। দিদি যাবার পর জামাইবাবু ভারি একলা হয়ে গিয়েছেন। সাধুটাধু হয়ে যেতে চাইছিলেন আর তুমিও তাল দিচ্ছিলে।'

'বাহ রে, জামাইবাবুর সঙ্গী জুগিয়ে দেবার জন্য এত চিন্তা তোমার? বুঝতে পারি নি তো আগে !'

'কি করব ? পাহাড়ে কোন চুলোয় গিয়ে যোগচর্চা করবেন ভাবলেন আর তুমি ওঁকে নিয়ে গুরুসন্ধানে বেরোলে। কোথায় কার খপ্পরে পড়ে সব খোয়াতেন কে জানে ?'

পতিতপাবন দূরে আলাপরত ভায়রাভাই আর গিন্নির স্পেশ্যাল গেস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুরু নির্বাচন হয়ে গিয়েছে মনে হয়। দেখ কিছু একটা নিয়ে মন দিয়ে আলোচনা করছেন। সম্ভবত যোগসাধনা নিয়ে।'

'উঁহু, সংযোগসাধনা নিয়ে।'

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

পাঁউরুটির গন্ধ

পথে যেতে যেতে কোন বেকারি পেলেই থমকে দাঁড়িয়ে যাবে বাসুদেবান। মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে, দুই চোখ অর্ধনিমীলিত, নাকের পাটা আর একটু ছড়িয়ে ভাঁটির থেকে সদ্য বের করা রুটির গন্ধে অবগাহন করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, ওহ্ গড, কি স্বর্গীয় গন্ধ। সেখানে থেকে তাকে সরিয়ে আবার যাওয়ার পথে ফেরত নেওয়া কোন সহজ কাজ নয়।

পাঁউরুটির সঙ্গে বাসুদেবানের এই সম্পর্ক জন্মলগ্নের। এভাবেই বলেছিল আমাকে সুতপা। কথাটা বাসুদেবান শুনলে খুবই আহত হত। কারণ পাও শব্দটা ওলন্দাজি, মানেই হল রুটি। তার বঙ্গ সংস্করণে রুটি যোগ করে ডাবল জিওপার্ডি হয়ে গিয়েছে। সত্যি যদি বলতে হয়, বাসুদেবান জন্মেছিল ব্যাগেট হাতে করে।

বাসুদেবানের বাবা রঙ্গনাথন সমাজতত্ত্বের ডক্টরেট করতে প্যারিসে এসেছিল সত্তরের দশকে। ম্যাদ্রাজের বাইরে তার আগে কোনদিন পা রাখে নি। দোসা ইডলি আর সম্বরসাধমের বাইরে কিছু খাওয়ার কথা ভাবতে পারত না। ভাগ্যিস বাইশ বছরের রঙ্গার সঙ্গে সদ্য বিবাহিতা আঠেরো বছরের ভানুমতীও এসেছিল। সঙ্গে মায়ের দেওয়া এক ট্রাঙ্ক খাওয়ার উপকরণ, যন্ত্রপাতি। অতএব ভানুমতীর খেল দেখাবার জন্য কোন কিছুর অভাব ছিল না। রঙ্গা ইডলি দিয়ে প্রাতরাশ করে, দুপুরে সাধম এবং রাত্রে কুজাম্বু আর কুরমা সহযোগে ভাত সাপটে তামিল ভোজন রীতি বজায় রাখছিল।

মুশকিল হল যখন রঙ্গা শহরের থেকে একটু দূরে লেভালয়ে এককামরার একটা বাড়ি নিল। শহরের পশ্চিমের এই বানিলিউটি অত জমজমাট নয়, পুরনো মাদ্রাজের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। মুশকিলটা সেখানে নয়। রঙ্গা যে বাড়িটা নিয়েছিল সেটা ছিল দোতলায়, তার একতলায় ছিল একটা প্যাটিসেরি। আগে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রঙ্গা তাওয়ায় সদ্যভাজা দোসার গন্ধ পেয়ে আনচান করত। এখন তারও আগে থেকে, বলতে গেলে সারাদিন বাড়ির আনাচে কানাচে থইথই করে ভাঁটিতে সদ্য পোড়ান রুটির গন্ধ।

রঙ্গা সেই গন্ধে মজে গেল।। যদিও ভানুমতীর ধারণা গন্ধ নয়, রঙ্গার সমস্ত ইন্দ্রিয় পড়ে থাকছিল ওই প্যাটিসেরির মালকিন ব্রিজেতের উপরে। এর কোন প্রমাণ নেই। সবসময়ে প্রমাণ থাকার দরকারও পড়ে না। তারা এই বাড়িতে আসার পরে পরেই একদিন সাদা অ্যাপ্রন জড়িয়ে ব্রিজেত, যে এই বাড়ির মালিকের বউও বটে, এক বাস্কেট ব্যাগেট এনে দিয়েছিল। সদ্য আভেন থেকে বের করা সেই শক্ত লাঠির মত ব্যাগেট যে কি সুস্বাদু হতে পারে সেটা ম্যাদ্রাজ বেকারির রোট্টী চাখা বাসুদেবান ভাবতেও পারেনি। কিন্তু বেচারা ওই ব্যাগেট খাওয়ার পরে সেদিন ভানুমতীর বানানো মসালা উত্তাপাম খেতে পারেনি জমিয়ে। ওই বাস্কেটে অনেকগুলো ব্যাগেট ছিল। লাঠির মত চেহারার এই সুখাদ্যগুলো বর্শার মত নাকি রঙ্গার দিকে ছুটে এসেছিল ভানুমতীর হাত হয়ে। ভানুম্মার কাছেই এই গল্প শুনেছে সুতপা। কপালে সাদা তিলক লাগানো ছবি হয়ে ঝুলতে থাকা রঙ্গনাথনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে এইসব গল্প করেছে ভানুম্মা।

তবু নাকি রঙ্গাকে ব্যাগেটের থেকে দূরে সরানো যায় নি। আগে রঙ্গা খাবার টেবিলে এসে মশলা দোসার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত, এখন জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু একটু করে ব্যাগেট ছিঁড়ে মুখে দেওয়ার অভ্যাস হল। জীবনটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে শিখছে যেন নতুন করে।

ভানুমতীর রাগ হবার বাস্তবিক কারণ ছিল। তার বানানো দোসা যেমন ফুলের পাপড়ির মত পাতলা তেমনি শুকনো পাতার মত কুড়মুড়ে। একেকদিন ভানু দোসা বানিয়ে ওঠার সময় পেতো না, রঙ্গা পরের দোসার জন্য হাঁ করে বসে

থাকতো। অথচ এখন যত দিন যাচ্ছে, রঙ্গা কখনো পেইন দ্য কাম্পানে আবার কখনো পেইন অয় লেভান খাচ্ছে অলিভ অয়েলে চুবিয়ে। শুধু সেখানেই থামলে কথা ছিল, ব্রিজেতের তত্বাবধানে পেইন অয় লেভান বানাতেও লেগে গেল একদিন। সে মজদুরি একদিনের নয়। ময়দা মাখাই হল চারদিন ধরে একটু একটু করে। রোজ তাতে আরও একটু ময়দা আর জল মিশিয়ে নতুন করে মাখার পর্ব শুরু হচ্ছিল। ভানুর চোখের সামনেই হচ্ছিল এইসব, তার রান্নাঘরের পবিত্রতা বিঘ্নিত করে। কিন্তু রঙ্গাকে দমানো যায়নি। ভানুর বিরক্তি অগ্রাহ্য করে রঙ্গা ক্ষণে ক্ষণে ববির ডিম্পলের মত মুখে ময়দাগুঁড়ো লাগিয়ে ব্রিজেতের কাছে ময়দার তাল নিয়ে চলে যাচ্ছিল তার অভিমতের জন্য।

সমস্ত আদব কায়দা বজায় রেখে অবশেষে দুরু দুরু বুকে আভেনে দিয়েছিল রঙ্গা। আভেনে গিয়ে ময়দার তাল ফুলে উঠল, গন্ধে মাতোয়ারা হল চারদিক। রঙ্গা বিশ্বাস করতে পারছিল না, এটা তারই হাতের কাজ। কিন্তু দেখতে দেখতে সেটা শক্ত লাঠির মত হল আর সেই রুটির মধ্যে একটা সুরঙ্গ পথ হয়ে গেল এমাথা থেকে অন্য মাথা। রঙ্গা নিয়ে গিয়ে দেখাতে ব্রিজেত হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায়না। যেহেতু ব্রিজেত শুধু ফ্রেঞ্চ ভাষা জানত আর রঙ্গার ওই ভাষায় দক্ষতা খুবই সীমিত, কথাবার্তায় অঙ্গসঞ্চালন একটা বিশেষ মাত্রা যোগ দিত বলাবাহুল্য। ভাষার পরিমিতির সুফলস্বরূপ রঙ্গা সেদিন সারা শরীরে এত বেশি সদ্য বানানো রুটির গন্ধ বয়ে এলেছিল, ভানুমতী তার সঙ্গে কথা বলেনি পাক্কা তিনদিন।

অতঃপর রঙ্গার ঘনঘন নিচের বেকারিতে যাওয়া বন্ধ হল। এরপর বহুদিন সে একেকটা ব্যাগেট নিয়ে ধীরে ধীরে ছোট ছোট টুকরো করত, আর ডিঙ্গি নৌকার মত সাজাত। মাঝে মাঝে তুলে তুলে গন্ধ শুঁকে রেখে দিত। খেতো একেবারে অনেক বাদে।

এমত অবস্থায় ভানুমতী সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। কিন্তু বাসুদেবান পেটে এসে যাওয়ায় টানা হ্যাঁচড়া করার মধ্যে যায়নি আর। বাসুদেবান অভিমন্যুর মত মাতৃগর্ভে থেকেই এক নরম খুশবুদার ভুলভুলাইয়ার পথ খুঁজে পেলো। সারাটা জীবনের জন্য সেখানেই আটকে গেল বেচারা।

বাসুদেবানেরও এসব শোনা কথা। বাসুদেবানের পদার্পন ঘটে আরও বছর খানেক বাদে, ওই বাড়িতেই। তাই বলা যায় জন্মের চতুর্থ দিন থেকেই বাসুদেবানের জীবনে প্যারিস বেকারির গরম ব্যাগেটের সুবাস পরিবেশগত প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায়। বাসুদেবনের যখন বয়েস বছরখানেক, রঙ্গনাথন পরিবার প্যারিস ছেড়ে এসে আস্তানা গাড়লেন মার্কিন দেশে। হাজির হলেন মিশিগানের ডেট্রয়েটে। মুশকিল হল বাসুদেবানকে নিয়ে।

লেভালয়ে থাকতে দুধ ছিল বাসুদেবানের একমাত্র পথ্য। সমস্ত তামিল শিশুর দুধ থেকে প্রমোশন হয় ইডলিতে। ভানু বাসুদেবানের মুখে ইডলি গুঁজে দিল, উত্তাপামের টুকরো ছিঁড়ে দিল, নরম দোসা ঠুসল, কিন্তু বাসুর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঢুকাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আই আই ও বলে মাথা ঠুকে রঙ্গার কথায় ব্রিওসে বান একটু একটু করে দুধে চুবিয়ে মুখে ধরা হল। ও মা! বড় আহ্লাদ করে সেটাই খেলো বাসু।

অসুবিধা শুধু বাসুদেবানের হয়েছিল সেটা নয়, বড় বিপাক রঙ্গারও। ফ্রেঞ্চ বেকারির গন্ধ নাকে না পেয়ে তার রাতের ঘুম ছুটেছে। ভানুমতী শুরুতে ব্রিজেটের বিরহ বেদনা গণ্য করে হুলুস্থুলু মাচালেও, শেষ পর্যন্ত রঙ্গার অনুনয়ে কোন ফ্রেঞ্চ বেকারির কাছে বাসা বদল করতে রাজি হয়।

সতেরশো সালে আন্তোনিও দে লা কাদিলাক তার সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জনা সৈন্য সামিল করে কানাডা মানে সেকালের নিউ ফ্রান্স থেকে এসে পত্তন করেন ফোর্ট পঞ্চারট্রেন দু দেত্রয়েত, সেইটাই একালে এসে হয়েছে ডেট্রয়েট সিটি। তাই ডেট্রয়েটে ফ্রেঞ্চ বেকারির অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বেকারি থাকলে শুধু হবে না, তার মাথার উপর থাকার জায়গা চাই। অনেক ঘুরে রঙ্গা দেখল অতটা সাযুজ্য সম্ভব নয়। অতঃপর অন্তত বেকারির কাছাকাছি একটা

বাড়ির খোঁজ হল। বাড়ির নিশানা পাওয়া গেলে ভোর রাতে তার বাগানে দাঁড়িয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকে তবে রঙ্গনাথন বাড়ি পছন্দ করেছিল।

বাসুদেবানের মত রঙ্গার বউ যদি বাঙালি হত, সে নিশ্চয় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত, ন্যাকা! হেরো দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় পেসাদ। কিন্তু অবশ্যই ভানুমতী এই উপমাটি জানত না। তাছাড়া রঙ্গার আসল টান যে পাঁউরুটির গন্ধে, ব্রিজেটের জন্য নয় সেটার এমন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার ফলে ভানুমতীর মনে কিছুটা অনুশোচনা বোধ জন্মায়, আবেগও। ফলত বাড়ি নিয়ে রঙ্গনাথনের আবদার আশাতিরিক্ত প্রশ্রয় পায়।

মিলানো বেকারির ধার ঘেঁষে একখানি একতলা বাড়িতে পরিবার সহযোগে এসে উঠেছিল রঙ্গানাথন। রাসেল স্ট্রীটের উপর এই বাড়িটি ডেট্রয়েটের ইস্টার্ন মার্কেটের ধার ঘেঁসেও, এর ফলে ভানুমতীর সম্বর আর কুরমার জন্য টাটকা সবজি পাওয়ার বড় সুবিধা হল। মিলানো বেকারি থেকে রোজ একটা ব্যাগেট বাগিয়ে বাড়ী ফেরা রঙ্গনাথনকে এই নিয়ে আর কিছু বলে নি ভানুম্মা। একদিকে দেখতে গেলে তার ইডলি, দোসা বানাবার পরিশ্রম লাঘব হল বই তো নয়।

সেই ছোটবেলা থেকে বাসুদেবানের প্রাতরাশে বিভিন্ন রকমের পাঁউরুটি বরাদ্দ ছিল। ভানুমতী মিলানো বেকারির দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে কোলের ছেলের মুখে ইডলি ঠুসে দেখেছে, থু থু করে ফেলে দিয়েছে সে। অর্থাৎ ছেলে বাপের এক কাঠি উপরে গেছে, যতরকম দক্ষিণ দেশীয় সুখাদ্য থেকে নিজেকে শতহস্ত দূর রেখেছে ছোটবেলা থেকে। দোসা খায়না এমন ছেলে কিভাবে নিজের প্রদেশের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করে থাকবে সেটা ভেবে শিউরে উঠেছে ভানুমতী। মা হয়ে তাকে মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু বউ কেন মানবে ?

সুতপা অবশ্যই দক্ষিণ দেশের নয়। কিন্তু পূবের মেয়ে তো বটে। বড় হয়েছিল কলকাতায়, তারপর পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় এসে বাসুদেবানের সহপাঠী। লুচি, পরোটা, কড়াইশুঁটির কচুরি খেয়ে তৈরী জিভ। ফুলকো লুচির উপর তর্জনী দিয়ে একটা গোঁত্তা মারলে শুধু গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ ভুরভুর করে ওঠে তা নয়, ধোঁয়া উঠে তার চশমার কাঁচে ভোরের কুয়াশা অবধি তৈরী হয়ে যায়। সে সুখ ছাড়বে কেন ?

প্যারোকিয়াল! স্বল্পভাষী বাসুদেবান মুখে বলেছিল। মনে ভেবেছিল প্রথম জেনারেশানের ইমিগ্রান্ট, এখনো দেশের শিকড় আঁকড়ে আছে।

শেষের কথাটা মুখে বেরোলে কি হত বলা মুশকিল, কিন্তু মুখ দিয়ে যেটা বেরোল সেটার উত্তরে ঘাড় ঘুরিয়ে মুখ ভেঙ্গিয়েছিল এক বছরের পুরোন বউ সুতপা। পরের ছেলে মোটা, সেটা জানো তো ?

বিয়ের চার বছর আগে থেকে বাসুদেবান আর সুতপার প্রেম, ইতিমধ্যে সে কিছুটা বাংলা রপ্ত করেছে, কিন্তু এইসব ভেতরকার উপমা বোঝে না। সে সাদা মুখে বলল, সে যেসব আমেরিকানদের মোটা দেখো সব বিফ খেয়ে। ভারতীয়রা পেট মোটা হয় ভাত খেয়ে। এই যে আমি রোস্টেড গার্লিক ফ্রেঞ্চ ব্রেড খাচ্ছি, তাতে একফোঁটা চর্বি হবে না।

বাসুদেবানের ব্রেডে আসক্তির কথা সুতপা বিয়ের আগে থেকেই জানত। তখন সেটা ভাবী বরের গুনবত্তার পরিচয় ছিল। বেশ কিছুদিন পরে সম্পর্কটা একটু আঁটোসাঁটো হতে বাড়িতে জানিয়েছিল। তামিল ছেলে মনে ধরেছে শুনে মা ম্রিয়মান। তেঁতুল গোলা জল দিয়ে ইডলি খেতে হবে, পারবি ? বাবার কথা ছিল, অন্য জাতেই যদি বিয়ে করতে হয় একটা সাহেবের সঙ্গেই তো –

সুতপা ততদিনে অনেকবার বাসুদেবানের সঙ্গে ডিনারে গেছে। বাসুদেবান যখন বিভিন্ন রকমের ব্রেডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়েছে গুনাগুন সহযোগে, সদ্য কলকাতা থেকে আসা মেয়ের কাছে সেটা অভিবাসী অভিজ্ঞতার পরাকষ্ঠা

হয়েই হাজির হয়েছে। এমন কি যেদিন বাসুদেবান তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছিল, সেখানেও বাবা আর ছেলের রসনার তাগিদে ভানুমতী সেরকম দক্ষিণ দেশীয় আহারের ব্যবস্থা রাখেনি। সব মিলিয়ে এইরকম উদার মানসিকতায় সুতপা গদগদ।

কিন্তু উদারতা ব্যাপারটা প্রেমের খোলা হাওয়ায় যতটা বিকশিত হয়, গার্হস্থ্যধর্মে অতটা ফনফনানি থাকে না। এমন নয় যে সুতপার লুচি বানিয়ে খাওয়া বারণ ছিল, অথবা বানালে বাসুদেবান একেবারে মুখে দিত না। কিন্তু বাড়িতে যে কোন সময় এত বিভিন্ন রকমের ব্রেড, সুতপার ভাষায় পাঁউরুটি মজুত থাকতো যে সেগুলো ফেলে লুচি বানানোর হ্যাপা নেওয়াও মুশকিল। বাসুদেবান সবসময়েই নতুন নতুন ব্রেডের রেসিপি জোগাড় করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। সুতপার মতে কাজ নেই তো খই ভাজ। তার কাছে ইংরাজির বেকার আর বাংলার বেকার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন নয় যে বাসুদেবান নিজেও খাবে অত ব্রেড। ফেলা যায় এমনিতেও, অথবা লোককে ডেকে বিলোতে হয়।

খাবে না তো বানাও কেন ?

ওই যে গন্ধ। সারা বাড়িটা সদ্য আভেন থেকে বের করা ব্রেডের গন্ধে ভুরভুর করছে আর বাসুদেবানের মনে শান্তির প্রলেপ।

অতই যদি গন্ধ চাই, তাহলে বেকারি খুলে বসো। আর সারাদিন ওখানে বসে গন্ধ নাও।

পাগল নাকি ? খদ্দেরের কথা মনে রেখে রোজ একই রকমের ব্রেড নিয়ম করে বানাতে হবে, সৃষ্টির আনন্দটাই মাটি। বাসুদেবানের সাফ জবাব। ব্রেড তার জীবনে এতটাই বড় জায়গা নিয়েছিল যে বিবাহবার্ষিকী মনে থাকুক চাই না থাকুক, একুশে মার্চ ন্যাশানাল ফ্রেঞ্চ ব্রেড ডে খুব ঘটা করে পালন করত।

এইভাবে পাঁউরুটি ওদের গার্হস্থ্য জীবনের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। বাসুদেবান যে শুধু বাড়িতে ব্রেড বানাত তা নয়, বাইরে খেতে গেলেও কোন রেস্তোরাঁতে খাবারের সঙ্গে কোন ব্রেড দেয়, তার গুণবত্তা এইসব মানদণ্ডে তাদের ডিনার আউটিং বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। তার উৎসাহ ব্যাগেট এবং অন্যান্য ফরাসী রুটি যেমন ব্যাটন, বুল, ফিসেলা বা ফ্লুটে আটকে থাকে নি। ইটালির ফোকাসিয়া, সিয়াবাটা থেকে শুরু করে জার্মান সারডো কিংবা পর্তুগিজি বোলান, মাফরা সবেতেই তার ঝোঁক, আর খুঁজে খুঁজে ওইসব জায়গা বের করে সেইখানেই যাবে। সুতপা মানবে কেন ?

তাছাড়া তার প্রশ্ন এতই যদি সব দেশের রুটিতে শখ, তাহলে ভারতের এত রকমের রুটিতে কি দোষ করল ?

বাসুদেবানের মতে যা ভাজা কিংবা সেঁকা হয় তারা অন্য প্রজাতির, এইসব ব্রেডের সঙ্গে এক সারিতে ফেলা যাবেনা। একমাত্র তন্দুরি রুটি নাকি কাছাকাছি আসে, কিন্তু জাতে ওঠে না। গন্ধ কোথায় ?

সুতপা একদিন ধুত্তেরি বলে ব্রেড খাওয়া বন্ধ করে দিল। সত্যাগ্রহ স্টাইলে। থাকুক, পচুক, ফেলে দিক ব্রেড সে খাবেনা। বাসুদেবান লুচির গন্ধকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না, তাই বলে সে কেন অমৃতে বঞ্চিত হবে? বাসুদেবান যেদিন সারডো বানাবে, সুতপা বানাবে আলু পরোটা। ফ্রেঞ্চ ফিসেলার সঙ্গে লড়তে এসে গেল তেকোনো পরোটা আর কালো জিরা দিয়ে সাদা আলু। বাসুদেবান যদি মাফরা নিয়ে টেবিলে বসে, সুতপা বানাবে রাধাবল্লভী। এর অনেকগুলোই আগে বানাতে পারতো না, মাকে ফোন করে করে শিখে নিতে হয়েছে।

যে কোন লড়াই একবার শুরু হলে নতুন নতুন অস্ত্রের আমদানি হতে থাকে। জিভে শান দেওয়া হয়। তাদের লড়াইটা বেড়ে জিভ থেকে কান অবধি পৌঁছাল। বাসুদেবান ফিসেলা বা ফ্লুট বানানোর সময় সঁসঁ বা ইয়েইয়ে সঙ্গীতে বাড়ি মাতায়, বারোক মিউজিক না হলে নাকি সারডো বানানোর মুড তৈরী হচ্ছে না। সুতপার ভরসা রবীন্দ্র সঙ্গীত। লুচি ভাজার সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত চালানো শুরু হল। বাসুদেবানের অতো বিরক্তির কারণ হয়নি কারন লুচি ভাজতে আর কত সময়ই বা লাগে। তেমন পাত্তাও দেয়নি। একদিন গান চলছে ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে, সেদিন হঠাত খুব মন দিয়ে শুনল। শেষ হতেই বলল, আরে সেদিন বানোক বানাবার সময় একটা পুরোন স্কটিশ গান চালিয়েছিলাম, সেইরকম সুর মনে হচ্ছে যেন।

সুতপা এটা প্রশংশা না আক্রমণ না বুঝতে পেরে গম্ভীর মুখে বলেছিল, তো ?

বাসুদেবান মুচকি হেসে বলল, না এরপর যেদিন আবার বানোক বানাবো, এই গানটা শোনা যেতে পারে।

তাদের বিয়ের সাত বছর হবে হবে করছে তখন। সাংসারিক জীবনের নৌকা পাঁউরুটির ধাক্কায় ডুববে ডুববে করছিল। এটা খড়কুটোর কাজ করল। বাসুদেবানের দিক থেকে শ্বেত পতাকাও হতে পারে। সারডো বানাবার সময় ওই মহামানব আসে গান চালান শুরু হল।

এই সব খবর পেতাম সুতপার কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথের গান ওদের সমঝোতায় সাহায্য করছে শুনে কোন রবীন্দ্র বিষয়ক পন্ডিত কি বলবেন আমি জানি না, আমার বাঙালী মন ফুরফুর করে উঠেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমুদ্রে ডুবতে চললে গানের ভেলায় আর কতদূর যাওয়া যায়। তারপর যদি আবার সমুদ্রের বুকে ঝড় ওঠে, তাহলে তো কথাই নেই।

ঝড় উঠল বাসুদেবানের আলকুরি যাওয়া নিয়ে। ইটালির সিসিলিতে আলকুরি এক দ্বীপ, একটা আগ্নেয়গিরিও আছে। শুনেই সুতপা চমকে উঠেছিল, তুমি সেখানে কি করতে যাবে ? এবার কি ব্রেড ছেড়ে আগ্নেয়গিরির পিছনে পড়লে ? আমাকে আর কত ভাবে জ্বালাবে বলো দেখি ?

ফোনের মধ্যে আমার কানের কাছে ভেঙ্গে পড়েছিল সুতপা। কি মিটমিটে শয়তান এই লোকটা বলে কিনা তুমিও চলো, একটা ব্রেক হবে তোমারও। বুঝলে সুতপা, ওই গ্রামে নাকি এমন ব্রেড তৈরী হয়, যেটা খেলে লোকে ওড়াউড়ি শুরু করে, অন্তত ডানা ওয়ালা পরীর সঙ্গে তো দেখা হবেই।

তুই কি বললি ?

কি বলবো আবার ? ব্রেডের জন্য কোথায় না যেতে পারে লোকটা। কিন্তু তাই বলে সিসিলি? আমি বাবা যাচ্ছি না ওসব সিসিলি মিসিলি। তবে চেক করে নিয়েছি, একাই যাচ্ছে। আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে কোন মেয়েবন্ধুকে বগলদাবা করে যাচ্ছে না কোথাও।

সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে কি হবে, এক ডানা কাটা পরীকে তাড়া করে একরাত সিসিলির জেলে কাটিয়ে ফিরেছিল বাসুদেবান। ইন্টারনেটের জমানায় কোন খবর তো চাপা থাকে না। সিসিলির স্থানীয় খবরের লিঙ্ক কোন বন্ধুর মারফত সুতপার কাছে পৌঁছায়, বাসুদেবান বিশ্বজয় করে বাড়ি ফেরার আগেই।

সে লোক যখন বাড়িতে ফিরল, বাড়িতে তুলকালাম হয়েছিল বলাই বাহুল্য। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, দোষ আমার নয়, আসলে কি জানো তো সুতপা, ওই ব্রেডের ব্যাপারটা সত্যি।

মানে? কি সত্যি।

আসলে ওই ব্রেড বানানো বন্ধ করে দিয়েছে ওরা অনেকদিন। রাই দিয়ে বানায়, ওদের রাইতে এমন কিছু থাকে, খেলেই হ্যালুসিনেশান। আমিই ওখানকার এক বুড়ো লোককে ধরে করে ওই ব্রেড আমার জন্য দুখানা বানাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। শুধু দুখানা। গরম গরম ব্রেড অলিভ অয়েলে চুবিয়ে চুবিয়ে খেলাম। কি অন্যরকম খেতে সুতপা কি বলবো।

এটা আমি এইভাবে লিখলাম, কিন্তু বাসুদেবান এই কথাটা বলার মাঝে সুতপা অন্তত পাঁচবার টিপ্পনী কেটেছে। আর আমাকে বলার সময় রসের ভিয়েন চড়িয়েছে আরও বেশী। সবচেয়ে বড় কথা সুতপা একবর্ণ বিশ্বাস করেনি। ফোনের অন্যপ্রান্তে ওর চোখ ঘুরানোটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন। বুঝলি না, এইসব শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতলব।

কিন্তু সেই ব্রেড খেয়ে হলটা কি ?

ওই লোকটার বেকারি থেকে বেরিয়ে পথে নেবেই বাসু দেখল হঠাৎ ওই রুক্ষ আইল্যান্ডটার চারদিকে ফুলই ফুল, তার কি রঙ, কি রূপ। সেই ফুলের বাগিচার উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছি নাকি আমি। ধ্যাৎ! এরকম আবার হয় নাকি।

তাহলে কি বলছি। এইসব গল্প শ্যামবাজারের মেয়েকে খাওয়াতে পারবে না। ওর নাকি মনে হল ওর সঙ্গে যাইনি বলে আমার অনুতাপ হয়েছে আর আমি পাখা মেলে উড়ে গেছি ওইখানে। ভাব একবার, গল্পের গরুকে কোন গাছে চড়াচ্ছে লোকটা নিজের দোষ ঢাকতে। রাগ হয় না ?

রাগ তো হয়েছিল সুতপার যথেষ্টই। বাসুদেবানকে ধুলো পায়ে ছেড়ে নিজের বেডরুমের দরজা বন্ধ করে আমাকে ফোন করছিল তাই।

গল্পটা জব্বর ফেঁদেছিল সুতপার বর কোন সন্দেহ নেই, আমারও জানতে ইচ্ছে করছিল কি হল তারপর।

তারপর আর কি। সে ওই ডানাওলা আমার পিছনে তাড়া করেছিল, বাগিচার মধ্যে ধরেও ফেলেছিল। আমি মানে সেই ডালা ওয়ালা পরী যার শরীরে কোন পোশাকের বালাই থাকে নি আর, ওরা ওখানেই –

অ্যাঁ?

আমি কি সাধে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি ? মেয়েটা ওই বুড়োর। সে হল্লা শুনে এসে বাসুদেবানকে পাকড়াও করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়।

ছাড়া পেলো কিভাবে ?

পুলিশ যখন জানল ওই ব্রেড খেয়ে বাসুদেবানের এমন অবস্থা হয়েছে, তখন ওকে ছেড়ে ওই বুড়োকে জেলে পুরে দেয়। ওখানে ওই ব্রেড বানানো আইন করে বারণ করে দেওয়া হয়েছে অনেক বছর আগেই।

আমি সুতপাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তাহলে তো সত্যি ওই রুটিতে কিছু ছিল। লোকটা তো আর জেনে বুঝে কিছু করেনি।

করেছে তো। সেটাই ডিভোর্স নেবার জন্যে যথেষ্ট।

এই বলে খটাং করে ফোন কেটে দিয়েছিল সুতপা। তার মানে রাগ এতটাই তুঙ্গে কেউ বাসুদেবানকে সমর্থন করলেও তাকে ধুনে রেখে দেওয়ার মুডে। আমাকেও রেয়াত করেনি।

এরপর মাস খানেক সুতপার কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ ছিল না। প্রথম পনেরোদিন আমিও রাগ করে ফোন করিনি। মুখের উপর ফোন কেটে দেওয়াটা ভুলতে সময় লাগছিল। যত বড় বন্ধুই হোক। কিন্তু তার পর আমি বার দুয়েক ফোন করলাম, ও ফোন তুলল না। না আর কোন খবর।

এর মধ্যে করোনার দাপটে আমরা সবাই লকডাউনে চলে গেছি। মানুষে মানুষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সুতপার কাছ থেকে কোন খবর নেই। কি রাগ রে বাবা মেয়ের। ফেসবুকেও আসে না। মনে হল যেন সারা পৃথিবীর উপর রাগ করে দোর এঁটে বসে আছে। এইসব ভাবছি, তখন একদিন ফোন।

সকালবেলা শিশির পড়ে মাটি নরম হয়ে থাকে। বৃষ্টি হলে যেমন হত সেরকম কাদা কাদা নয়, শুধু ভেজা নরম। সুতপার গলাটা তেমনি। কি রে এতদিন বাদে মনে পড়ল ?

বাসুদেবানের করোনা হয়েছিল রে।

বজ্রপাত। কেমন আছে ? কিভাবে হল ? এখন কোথায় ? তোর হয়নি তো ? অঝোরধারায় নেবে আসি আমি সুতপার ওপরে।

না, না বাড়ি ফিরে এসেছে। আসলে ওই সময়ে ইটালিতে গিয়েছিল তো, সেখান থেকেই ভাইরাস নিয়ে ফিরেছিলেন বাবু। আই সি ইউ তে ছিল পনেরোদিন, তিনদিন আগে ফিরেছে।

আর তুই ? তোর হয়নি ?

না, আমি তো দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। ঘর থেকে বের হইনি একদিন। এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের প্যাঁ প্যাঁ শুনে যখন দরজা খুলে বেরোলাম, ওরা বাসুদেবানকে নিয়ে চলে গেছে। বলতে বলতে এবার সুতপার গলা দুধে ডুবানো পাঁউরুটির মত ক্যাতক্যাতে হয়ে গেল। যাওয়ার আগে একবার দেখতেও পাইনি। যদি কিছু হয়ে যেতো –

সুতপা যে ওই লোকের মুখ জীবনে আর দেখবে না এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল ফোনে, সে কথা মনে করিয়ে দেওয়ার সময় এটা নয়। বরং ওকে তুলে ধরার প্রয়াসে বললাম, সে যাক গে, এখন তো ফিরে এসেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ তো ?

একটু দ্বিধা মেশানো গলায় বলল সুতপা, হ্যাঁ এমনিতে তো সুস্থ। তবে একটা অসুবিধা হয়েছে। ওর নাকে কোন গন্ধ নেই।

বলিস কি ?

হ্যাঁ রে, লোকটা পাঁউরটির গন্ধ শুঁকতে না পেয়ে পাগল পাগল করছে।

সেতো বেশ ভাল তোর জন্যে। অজান্তেই গলায় একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তোদের গন্ধের লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেল। এরকমটাই থাকবে নাকি ?

ডাক্তার বলেছে দুমাসও লাগতে পারে, আবার ছমাস হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর নাকে কোন গন্ধই ঢুকছে না রে। কত চেষ্টা করলাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

তুই কি আর করতে পারিস বল। স্বান্তনা দিলাম। ডাক্তার যদি –

দেখি কি হয়, রোজ পাঁউরুটি শুঁকাচ্ছি, তাতে যদি কিছু হয়।

বাসুদেবান এই শরীরে এখন আবার ব্রেড নিয়ে পড়েছে কেন ? কদিন জিরোতে বল।

না, না আমিই বানাচ্ছি। ওর রেসিপিগুলো তো আছেই। একেকদিন একেকটা বানাই।

সুতপা ব্রেড বানাচ্ছে ? আমার মুখে কথা সরলো না কিছুক্ষণ। খাচ্ছে ও ? গন্ধ তো পাচ্ছে না।

ওই রবীন্দ্রনাথের গান চালিয়ে দিই। যেদিন যেই দেশের রুটি, তেমনি গান। এই তো এখন ওই মহামানব আসে শুনতে শুনতে সারডো ব্রেড খাচ্ছে। শব্দ দিয়ে গন্ধের ক্ষতিপূরণ হয় যদি।

জীবনের গল্প থেমে থাকে না। সম্পর্ক অনেকটা নদীর মত, বাঁক নিতে নিতে এগোয় নিজের মত। যখন বাসুদেবানের ঘ্রাণশক্তি ফিরবে, তখন কি হবে এখন থেকে বলা মুশকিল। ফিরবেই যে তাই বা কে বলতে পারে।

নন্দিনী ব্যানার্জী

চরৈবতী

আজ মহালয়া। রাত্রির ঘুম অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। সারা রাতই প্রায় আধো ঘুম আধো জাগরণেই কেটেছে রাত্রির। ঘড়ির কাঁটা এখন ভোর চারটে বলছে। চটপট অনিন্দ্যর পাশ থেকে উঠে পড়ে রাত্রি মহালয়ার সিডি'টা চালিয়ে দিল। অনিন্দ্যর আবার ঠিক ভোর রাতেই ঘুমটা জাঁকিয়ে আসে। এমনিতেই ছ'টার এলার্ম বাজার সাথে সাথেই বিছানা ছাড়তে হবে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য, এর মধ্যে রাত্রির ছেলেমানুষী আজকের চল্লিশার্ধ্ব অনিন্দ্যর মনে বিরক্তি ছাড়া আর কিছুর উদ্রেক করে না। ঠিক যখন পাশ বালিশ আঁকড়ে ধরে আরেকটু ঘুমের চেষ্টা করছে সে, তখনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে অনিন্দ্যর ঘুমের চটকা যায় ভেঙ্গে। তিতিবিরক্ত মন ভাবে "রাত্রি আর কতদিন ? দেশ হতে যোজন মাইল দূরে এই বিদেশে বসে আর কতদিন মহালয়া পালন করবে ?" গৃহস্থ্য জীবনের অশান্তি এড়াবার জন্য মুখে বলে –

"সত্যি, ভদ্রলোকের গলায় মহালয়া শুনলে দেশের ও দশের কথা মনে হয়, তাই না রাত্রি ?"

উদাস রাত্রির মন তখন কোথায় ? নিজ জগত পরিক্রমায় মত্ত সে তখন ।

মনে আসে ... অনেক রাতে সে জন্মগ্রহণ করায় বাবা তার এই নামকরণ করেছিলেন। সিডি প্লেয়ারে মহালয়া বেজে চলে আর রাত্রির চোখে তখন ঘোর। বহুযুগের ওপার হতে যেন বহুদিনের পুরানো কথা, ছবি, চরিত্ররা সব একে একে ফিরে আসে, "রাত্রির" সাথে সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার কথা বলার জন্য ।

শহর কলকাতার বাড়ি, এমনি এক মহালয়ার সকাল, চোখে ঘুমের রেশ থাকা সত্বেও, সে এক অদ্ভুত উপলব্ধী; আকাশ বাতাস থেকে টুপ টাপ যেন ঝরে পড়ছে শরতের আগমনী বার্তার ধ্বনি ... বাগান থেকে বয়ে আসা শিউলী ফুলের সুবাস ... আর মায়ের সেই অকৃতি – "রাত্রি, ওঠ মা। সকাল হয়ে গেছে, শিউলি ফুল তুলবি না ? তার আগে স্নানটা সেরে নে, তারপরে বেশ করে ঠাকুরের জন্য একটা মালা গেঁথে দে মা ।"

ছোট রাত্রির চোখে তখন ঘুম, আজকের অনিন্দ্যর মতো সেও বিরক্ত হয় কিন্তু মায়ের সান্নিধ্য একটু পাওয়ার আশায় মাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলে ওঠে –

"ভাইকে বলো মা।"

শারদপ্রাতের ওই মুহূর্তে মাকে জড়িয়ে ধরে আদর খেতে রাত্রির খুব ভালো লাগত । মায়ের হাসিভরা মুখ, তার গায়ের সেই একটা অদ্ভুত মন ভালো করা গন্ধ রাত্রিকে আবিষ্ট করে রাখত। মনে হত এই অদ্ভুত বন্ধন, ভালবাসা বা টান শুধুমাত্র তারই। এ কোনদিনও শেষ হওয়ার নয়। রাত্রির মাথায় হাত রেখে, মেয়েকে ভালবাসায় ডুবিয়ে দিতে দিতে মা বলে উঠতেন –

"তুই ওঠ মা ! ভাই তো ছোট, ও কী আর তোর মতো পারবে? ওঠ মা, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে যে ..." এই বলতে বলতে দ্রুত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মা পুজো ঘরের দিকে রওনা দিতেন ।

আকাশবাণী ভবন থেকে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে সরাসরি সম্প্রচারণ শোনার জন্য কাক ডাকা ভোরে কলকাতার সারা বাড়ি জুড়ে তখন হুল্লোর পড়ে যেত। শুধুই তো মহালয়া নয়, ঐদিন তো পিতৃপুরুষদের জল দানেরও দিন মানে তর্পনেরও দিন । জেঠিমা জেঠুকে তাগাদা দিছেন শীঘ্রই স্নান সেরে, মহালয়ার প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার সাথে

সাথে বাজার সেরে আসতে। সকাল ১০ টার মধ্যে ঠাকুর মশাই এসে পরবেন, ৯ টার মধ্যে রান্নার মাসিকে বুঝিয়ে দিতে হবে জেঠিমার । মা ভীষণ ভাবে ব্যস্ত ঠাকুর ঘরের সাজসজ্জায়। কাকিমা রান্নাঘরে লুচির ময়দা ঠেসা আরম্ভ করেছেন আর আলুর দম যে বসে গেছে তা শুয়ে শুয়েই রাত্রি বলে দিতে পারে। কাকিমার হাতের আলুরদমের জুড়ি মেলা ভার। জলখাবারের আগেই পিসিদের সব আসার কথা। রাত্রির বেশ ভালো লাগে ভাবতে যে সেদিন পড়াশুনা করতে হবে না। আজকে জেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো, ভাই বোনদের সাথে খালি খেলে বেড়ানোর দিন। আজকে যে ছু ... টি ...। ইসস কি মজা যে আজ ... চোখ বন্ধ করেই আলহাদিত রাত্রি একটা ছোট হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গে ... সঙ্গে সঙ্গে বাবার ডাক ... "রাত্রি, রাতু বুড়ি, রাতু মা ... রাতি পোহাইল ওঠো রাতু মা ... বুড়ি উঠবি না ? দাঁড়া তোর খানিক দাঁড়ি বানিয়ে দি ..."। ধরফরিয়ে ছোট রাত্রি উঠে পড়ে ঘুম থেকে। এটাতে তার বড্ড ভয়। বাবার দাঁড়িতে ঘষার বুরুশ তার গালে লাগালে সত্যি সত্যি যদি তার দাঁড়ি উঠতে আরম্ভ করে ? রাত্রির ধরফরানো দেখে বাবার এক গাল হাসি, মা'কে বলে ওঠে, "নাও গো তোমার মাটু বুড়ি উঠেছে ... এবারে তোমার কাজ গুলো ওকে দিয়ে করিয়ে নাও ... হা হা হা ..."।

বাবার সেই হাসি আজকেও দেশে থেকে শত মাইল দূরে দিক থেকে দিগন্তে হয় প্রতিধ্বনীত। আজকের রাত্রির চোখে জল আসে। ঘরের চারিধারে দীঘল চোখের দৃষ্টি খুঁজে ফেরে বহু বছর পূর্বের হারানো সেই সংসার'টাকে। সেই সময়'টাকে, সেই ক্ষণ'টাকে। সময়ের সাথে সব কিছু'কে হারানোর এক তীব্র বিষাদ এসে যেন রাত্রি'কে ভর করে ।

রাত্রির মৃদু ফোঁপানির আওয়াজ অনিন্দ্যর কান এড়াতে পারে না। প্রতি বছরের মতো এবারেও উঠে সিডি প্লেয়ারের ভলুমটা কম করে নিঃশব্দে স্ত্রীকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে পরম মমতায়। ছেলেবেলার সবকিছুকে হারানোর বেদনা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয় অনিন্দ্যর নিবিড়তায়। অতীতের ক্ষণগুলি মূহুর্তে হয় অদৃশ্য চোখের সামনে থেকে । সিডি'তে দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়ের গলায় প্রভাতী দেবী বন্দনা সুরু হয় ...

"জাগো তুমি জাগো ... জাগো মা দূর্গা জাগো দশপ্রহরণধারীনী ..." এর সাথেই বর্তমানের রাত্রি চোখ মুছে উঠে পরে বিদেশের কর্মবেস্ততাময় জীবনে নিজেকে সঁপে দেবার জন্য। আজ তাকে ফুল তুলে আনার জন্য কেউ বলবে না, আজ তার কাছে আলসেমীর নেই কোনো দাম, নেই কোনো ছুটি, সংসার চক্রের কাজ হবে সারতে, কাজে হবে বেরোতে, সময়টা কে মুঠোর মধ্যে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আজকের রাত্রি যে "TIME MANAGEMENT" এর এক দক্ষ কর্মী। সময়কে বেঁধে জীবনে চলাই যার প্রধান লক্ষ্য। মনে এলো Lord Tennyson এর লেখা "The Brook" poem এর দুটি পংক্তি: (ছোট বেলায় বাবা সবসময় বলতেন ...)

"Men may come, and men may go,

But I go on for ever" ...

চরৈবতী চরৈবতী চরৈবতী .... চলার নামই জীবন ।।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

স্নিকার ...

বেডরুমের কাঁচের জানলার গায়ে নিশ্চুপ একটা দিনের প্যানারোমিক ভিউ।

প্রকৃতির দৃশ্যপটে এক অদ্ভুত আলোর খেলা, শরতের স্টারলিং সিলভার রোদ ওক,

পাইনের পাতা ছুঁয়ে লুটিয়ে পড়ল মৈথিলির সদ্য মেলা চোখের পাতায় ;

আজকাল ঘুম ভাঙলে মাথার ভেতরটাকে কেমন অচেনা লাগে যেন হালকা মেঘের স্কার্ফে মোড়া পাহাড় ... ভারী আর ধোঁয়াশায় ঢাকা।

যেন ছোট্ট একটা আদুরে পুডুল গলায় ঝোলানো লকেটে লেখা আমি হারিয়ে গেছি। মৈথিলি মনে করতে পারেনা এখন সকাল না বিকাল, মনে করতে পারেনা কোথায় আছে ! বিছানার চাদরে আলগা ভাঁজ,পাশের বালিশে একটা চেনা মুখের ছাপের সাথে জড়িয়ে একটা ছোট্ট ছায়া ... ছায়ার ভেতরে একটা কচিমুখ ... মৈথিলি বোঝেনা ও কাকে খুঁজছে ! বিছানা ছেড়ে প্যাটিওর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, একটা হলুদ অভিমানি রোদ্দুর লুটিয়ে আছে প্যাটিওর কাঠের ফ্লোরে, আবার বুঝতে চেষ্টা করে এখন সকাল না বিকেল ;

মাউন্ট লরেলের শহরতলির ল্যান্ডস্কেপে ছোট্ট একটা পুরোনো কলোনিয়াল হাউস,

ফেন্সহীন ব্যাকইয়ার্ড ঢালু হয়ে নেমে শেষ হয়েছে ওক,মেপলের ঘেঁষাঘেঁষি জঙ্গলে, উজ্জ্বল কমলা, লাল, হলুদে সেজে আছে গাছেরা এক পাতাঝরা কালের অপেক্ষায় ;

একটা সজল চোখের হরিণী তিনটে বাচ্চা আর তার সাথীকে নিয়ে রোজ বিকেলে উঠে আসে ওই পথ ধরে, মৈথিলির চোখ ওদের খোঁজে ... যেখানে বাদামী ট্রেল ... সবুজ পাইনের ছুঁচোলো পাতা আর

কিছু ভুলে যাওয়া ...

হঠাৎ মনে পড়ে সদ্য কেনা নতুন বাড়ীর পর নেক্সট সামারে আর্যর প্রোজেক্ট পেছনের জঙ্গলের ম্যাচিং একটা পুরোনো চলা ওঠা বাদামী ফেন্স তৈরী আর একটা শিবা ইনু ...

আরিয়ণ আর ওর শিবা ইনু একসাথে হুটোপুটি করবে ফেন্সড ব্যাকইয়ার্ডে ...

ভয়হীন ঘেরাটোপে ...

দূর থেকে ভেসে আসে একটা ঘুঘুর ডাক, নির্জন চরাচরে ঘুঘুর ডাকে ছড়িয়ে পড়ছে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা, মৈথিলি বোঝেনা ঘুঘুর ডাকটা কী ওর পূর্বজন্মের স্মৃতি নাকি সত্যি !

হঠাৎ মনে পড়ে কী যেন ভুলে গেছে! কী যেন করার ছিল ! মনের বিষণ্ন ছায়াপটে বিপর্যস্ত চিন্তার জাল, মাথার ভেতর ক্রমে জমে ওঠে স্তব্ধ শীতলতা, মনে পড়ে না কিছুই, ভেজা চোখের পাতায় টুপটাপ ঝরে দুফোঁটা কান্না।

এই যে অকারণ সব ভুলে যাওয়া এটা কি মনের দুষ্টুমি ? নাকি জীবনের যোগ বিয়োগ, চাওয়া পাওয়ার অঙ্কগুলো মেলাতে পারছে না ব'লে মনটা ভুলে যাওয়ার একটা ভান করে ! এলোমেলো ভাবনার ভেতর মৈথিলির মনে পরে দু জোড়া স্নিকার ...

একজোড়া বড়, একজোড়া ছোট,

নতুন পাড়ায় বাবা, ছেলে বিকেলে জগিং করতে বেরিয়েছিল, দুজোড়া স্নিকার বাড়ী ফিরলেও ওরা এখনও ফেরেনি মৈথিলি সেই হরিণী মায়ের মত চকিত চাহনিতে নিজের স্নিকার খোঁজে, সাঁঝ নামার আগে ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে দুজোড়া স্নিকার হাতে নিয়ে ব্যাকইয়ার্ডের ঢালু পথ পেরিয়ে মৈথিলি নেমে যায় জঙ্গলের দিকে ...

সমাদৃত চক্রবর্তী

দরজার আড়ালে

(প্রথম দৃশ্য)

(কলকাতা। ধর্মতলা। বিকেল পাঁচটা। পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালো নীল। নীলের বয়স চল্লিশের মতো, ছিপছিপে চেহারা। তার নজর পানের দোকানটার দিকে। সেখানে তারই বয়সী এক মানুষ পান কিনছে। নীল পায়ে পায়ে এগোয়।)

নীল – সুতনু না ?

সুতনু – (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আরে, নীল! কতদিন পরে! কেমন আছিস ?

নীল – ভালো। চ', ওই চায়ের দোকানটায় বসি।

(চায়ের দোকানে)

সুতনু – তুই এখন কোথায় থাকিস নীল ?

নীল – বেহালা। তুই ?

সুতনু – সেই আগের বাগবাজারেই। আয় না একদিন।

নীল – আসব। তারচেয়ে তুই এক কাজ কর। এই উইক এন্ডে ফাঁকা থাকলে চল আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি।

সুতনু – কোথায় ?

নীল – সে এক ঘটনা। আমার মামার এক বাড়ি আছে বর্ধমানের বুদবুদে। মামা বিয়ে-টিয়ে করেনি, মারা গেছে ক'দিন আগে। সেই বাড়ি এখন আমার। শনিবার যাচ্ছি সেই বাড়ি দেখেশুনে আসতে। একলাই যাচ্ছি। তুই যাবি ?

সুতনু – বেশ তো যাব।

নীল – তাহলে তোকে শনিবার সকাল ন'টায় এখান থেকেই তুলব গাড়িতে।

সুতনু – ওকে।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(রাত দশটা। বুদবুদ, নীলের মামার বাড়ি।)

সুতনু – এখানে এসে ভালো কাটছে রে নীল। এতোবড় বাড়ি, সামনে বাগান, চারদিক ফাঁকা।

নীল – আর আমার রান্নাটা বল !

সুতনু – হ্যাঁ রে, দারুণ। চিলি চিকেনটা তো ফাটাফাটি হয়েছিল।

নীল – শুয়ে পড়ি চল। কাল সকালে আশপাশের জায়গাগুলো ঘুরে দেখবো একটু।

(তৃতীয় দৃশ্য)

(শোওয়ার ঘর)

সুতনু – এই নীল ! নীল !

নীল – কি হল ?

সুতনু – একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?

নীল – শব্দ ? কিসের ?

সুতনু – শোন মন দিয়ে, যেন একটা বন্ধ দরজা খুলতে চাইছে কেউ ।

নীল – (মন দিয়ে শুনে) তাই তো । একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, কোনদিকে হচ্ছে বল তো ?

সুতনু – মনে হয় রাস্তার ওপরের দরজাটায় ।

নীল – (পর্দা তুলে খানিকক্ষণ দেখে) এই সুতনু দেখ । দরজাটা নড়ছেও ।

সুতনু – কি ব্যাপার বল তো? গিয়ে দেখবি একবার ?

(শব্দ থেমে যায়)

নীল – থেমে গেল । আজ আর গিয়ে কাজ নেই বুঝলি! কাল সকালেই দেখব'খন ।

সুতনু – বেশ ।

(চতুর্থ দৃশ্য)

(সকাল এগারোটা । বসবার ঘর ।)

নীল – কিছুই তো বোঝা গেলনা রে সুতনু । অনেক তো কারণ খুঁজলাম ।

সুতনু – সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, দরজাটা যেই খোলবার চেষ্টা করুক, তাকে দেখা গেলনা কেন? দরজার কাছের মাটিতে কারও পায়ের ছাপও তো পেলাম না ।

নীল – সুতনু, একটা কথা বলব ? হ্যাঁ রে, এটা আমার মামার প্রেতাত্মা নয় তো ? মামার খুব মায়া ছিল বাড়িটার ওপর । কলকাতাতেও যেতনা বিশেষ বাড়ি ছেড়ে ।

সুতনু – কি বলছিস যা-তা ?

নীল – হ্যাঁ রে, এমন হয় শুনেছি । সুতনু, এ' বাড়ি দরকার নেই আমার । চল, পালাই ।

সুতনু – (চিন্তিত ভাবে) বলছিস ভূতের বাড়ি ? নীল, আজকের রাতটা থেকে যাবি প্লিজ ?

নীল – কেন ?

সুতনু – আজ রাতে খাওয়ার পর বাগানে থাকব আমরা । দেখব ভূত আসে কিনা ।

নীল – কি দরকার এসবের ?

সুতনু – আরে, তোর মামা তো ভালোবাসত তোকে । এলেও ক্ষতি করবেনা তোর ।

(পঞ্চম দৃশ্য)

(বাগানের ভেতর)

নীল – মাঝরাত হয়ে গেল। কিছু তো হলনা। চল, ভেতরে যাই।

সুতনু – আরেকটু দাঁড়া।

নীল – (সুতনুর হাত চেপে ধরে) সুতনু, ওই দেখ, শব্দটা শুরু হল ! দরজাটাও কে যেন ঠেলছে !

সুতনু – চল, কাছে গিয়ে দেখি।

নীল – (সুতনুর হাত আরও জোরে চেপে ধরে) না না।

সুতনু হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে যায় দরজার কাছে। তারপর হা হা করে হেসে ওঠে।

সুতনু – নীল, দেখে যা তোর মামাকে।

নীল – (দৌড়ে গিয়ে) এ কি রে ! এ তো একটা ধেড়ে ইঁদুর !

সুতনু – হ্যাঁ, এই ব্যাটাই রাতে দরজা ঠেলে বাগানে যাতায়াত করে। তাই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় আর দরজাও নড়ে কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া যায়না।

নীল – হা ভগবান, আর আমি ভাবছি বুঝি মামার ভূত !

(হা হা করে হেসে ওঠে দুজনে)

******* সমাপ্ত *******

উদয় মুখার্জী

কিছু অল্পজানা তথ্যের খোঁজে

মাঝে মাঝেই আমার পরশমণির খোঁজে অতলান্ত জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে আর সাথে আমাদের নমস্য ব্যক্তিদের / বিভিন্ন ধর্মীয় – দর্শনীয় স্থানের / অন্যান্য বিষয়ের কিছু অল্পজানা তথ্যের সম্ভার আহরণ করে আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে একান্তই ইচ্ছা আমার – তাই আমার নিবেদন পর্যায়ক্রমে একান্তই আপনাদের জন্য ।

– উদয় মুখার্জী

তাহলে আসুন জেনে নিই আজকের একটি বিশেষ অল্পজানা ঘটনা যেখানে আছেন আমাদের সোনার বাংলার দুই বিশেষ গুণী ব্যক্তিত্ব –

কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রী অরবিন্দ

ঘটনা স্থল – পন্ডিচেরী, দক্ষিণ ভারত
বঙ্গোপসাগরতটে

দিনক্ষণ – ২৯শে মে, ১৯২৮
সকাল প্রায় ১০ টা

প্রথমেই বলি, ইতিহাস ঘাঁটলেই আমরা পাই অগস্ত্য মুনি পন্ডিচেরীকে সাধন-পিঠ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তারপর প্রায় ৫৫০ বছর আগে এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ এই পন্ডিচেরীতে এসেছিলেন আমেরিকা – জয়ের পথে, তারপরে এসেছিলেন শ্রী অরবিন্দ – ছিলেন প্রথমে সেই বাড়িতেই যেখানে স্বামীজি ছিলেন। তারপরে এসেছিলেন কবি ভারতীয়ার, শ্রীমা (The Mother) ইত্যাদি। এর কারণ পন্ডিচেরী সেই সুদূর অতীত থেকে এক বিশেষ ধার্মিক মিলনক্ষেত্র ও শান্তি-স্থল রূপে পরিচিত ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছিলেন পন্ডিচেরীতে ১৯২৮ তে শ্রী অরবিন্দের সাথে দেখা করতে। সেই সময়ে শ্রী অরবিন্দ কারো সাথে দেখা করতেন না ও নির্বাক সাধনা করছিলেন।

কবিগুরুর হঠাৎ ইউরোপ যাত্রার নিমন্ত্রণ এল – অনেকদিন শ্রী অরবিন্দর সাথে দেখা হয় না – তাই মাদ্রাজ-পন্ডিচেরী-কলম্বো হয়ে ইউরোপ যাবেন বলে মনস্থ করলেন ও শ্রী অরবিন্দের সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে শ্রীমাকে লিখলেন – বিশেষ অনুমতি পেয়েও গেলেন। (এই প্রসঙ্গে বলি, কবিগুরু এই বিদেশি মহিলার অঙ্কন পারদর্শিতা ও অন্যান্য গুণাবলির পরিচয় পেয়ে তাঁর স্বপনের শান্তিনিকেতনের দায়িত্বভার নিতে অনুরোধ করেন কিন্তু শ্রীমা এই অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখান করেন কারণ তিনি আগেই শ্রী অরবিন্দের সাধন – পথের সঙ্গ ও আশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন) Chantilly জাহাজে কলকাতার থেকে মাদ্রাজ হয়ে পৌঁছলেন পন্ডিচেরী। এক তো ক্যাপ্টেন ও অন্য যাত্রীদের আপত্তি ছিল এই যাত্রাবিরতিতে – কিন্তু নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবিগুরু বলে কথা ! জাহাজ কোম্পানির কাছে তিনি তো VIP। তার উপরে আর এক বিপত্তি পন্ডিচেরী জাহাজঘাটার জেটি মেরামতির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল – নামা-ওঠার কোনো উপায় নেই ।

কিন্তু কবিগুরুর জেদ ধরে বসে আছেন যে তিনি জাহাজ থেকে নেমে শ্রী অরবিন্দর সাথে দেখা না করে যাবেন না।

ক্যাপ্টেন তো প্রমাদ গুনলেন – কি করা ?

এগিয়ে এলেন জাহাজের এক carpenter – একটি বিরাট কাঠের barrel কেটে তার ভিতরে একটি কাঠের stool বসান হল – কবিগুরুর বসলেন barrel এর ভিতরে stool এর উপর – barrel এর দুপাশে ring এ দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হলো crane এর সাহায্যে ও নামান হলো একটি নৌকোর উপর।

(ভাবুন তো সেই বিরল সাহসী দৃশ্য)

নৌকো নিয়ে গেল তাঁকে ঘাটে যেখানে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় ছিলেন শ্রী নলিনী কান্ত গুপ্ত (শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের secretary) যাঁকে পাঠিয়েছিলেন শ্রীমা ।

কবিগুরু বহুদিন পরে শ্রী অরবিন্দকে দেখে যতটাই খুশি ও আনন্দিত হলেন ততটাই হলেন অবাক – শ্রী অরবিন্দকে দেখেছিলেন অস্থির ও চঞ্চল আর এইবার দেখলেন শান্ত - সমাহিত ।

কবিগুরু সেদিন আবার আবৃত্তি করে উঠেছিলেন তাঁরই লেখা কবিতা –

"নমস্কার" যেটি ১৯০৭ সালে তিনি শ্রী অরবিন্দকে উৎসর্গ করে রচনা করেছিলেন –

শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার . . .

মাত্র কুড়ি মিনিট স্থায়ী হয়েছিল কবিগুরু ও নির্বাক শ্রী অরবিন্দর এই বিশেষ সাক্ষাৎ। কবিগুরু আবার ফিরলেন জাহাজে সেই barrel এ, যেমন করে এসেছিলেন।

এই বিশেষ সাহসী ও বিরল সাক্ষাৎকার অমাদের কাছে একটি অল্পজানা তথ্য ।

কৃতঙ্গতা স্বীকার –

"The Hindu" – সাতই জুন, ২০১৫

"The descent of the blue" by
Sri Chinmoy

অজানা লেখকেরা – উৎস internet

মিতালি রায়

উলকি

জ্বলন্ত উনুনের উপর বসানো হাঁড়িতে জল ফুটছে টগবগ করে। একবাটি চাল ধুয়ে তারমধ্যে ঢালতে ঢালতে গজগজ করছিল ঝুমড়ি। একটু দূরে ফুটপাথের ওপর দেওয়াল ঘেঁষে উবু হয়ে বসে আছে ঝুমড়ির শাশুড়ি, দেবুর মা, বুড়ি। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

সকাল থেকে চা টাও জোটেনি। আজ আর জুটবে কি না সন্দেহ আছে ! মনে মনে নিজের ছেলে দেবুর ওপর রাগ করে বুড়ি।

যেদিন মেজাজ ভাল থাকে সেদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে উনুন সাজিয়ে রেখে পাশের ছোট স্টোভটা জ্বালিয়ে দুকাপ চা করে ঝুমড়ি। এককাপ দেয় দেবুর মা কে, আর এক কাপ সে নিজে খায়।

চা খাওয়া হয়ে গেলে ঝুমড়ি রাস্তার ওধারের আবাসনে যায় ঠিকের কাজ করতে, তখন ছেলে মেয়েরা কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। কেবল দেবুর মা চা খেয়ে উবু হয়ে বসে থাকে দেওয়াল ঘেঁষে আর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

ঠিক সাতটার সময় মন্ডলদের ফ্ল্যাটে কলিংবেল বাজায় ঝুমড়ি। আগের দিনের বাসি বাসন মেজে, ঘর ঝাড়ামোছা করে, বালতিতে ভেজানো কাপড়জামা কেচে বারান্দার দড়িতে মেলে তার ছুটি। তারপর সে যায় আরেকটি ফ্ল্যাটে সেখানকার কাজ সেরে ঝুমড়ির ঘরে ফিরতে প্রায় সাড়ে নটা দশটা বাজে।

ছেলে মেয়ে দুটোই ঘুম থেকে উঠে পড়ে, ফুটপাতের ওপর খেলতে থাকে অন্যদের সঙ্গে। ছেলেটার বয়স বারো পেরিয়ে তেরো হল গত কার্ত্তিকে। স্কুলে যেতে চায় না মোটেই। ঝুমড়ি হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় স্কুলে। একেবারে স্কুলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে আসে। এরমধ্যেই ছেলেটা বিড়ি খেতেও শিখেছিল। ঝুমড়ির চোখে যেদিন প্রথম পড়েছিল কান মুলে ঠাস ঠাস করে দুচার চড় কষিয়েছিল ছেলের গালে। ছেলেটা গুম মেরে ছিল কয়েকটা দিন, মুখে রা কাড়ে নি।

ঝুমড়ি বুঝতে পারে, রাস্তার পাশের বটগাছটার নিচে যে মস্তান ছেলেগুলো দিন রাত বসে আড্ডা মারে, গাঁজা ভাঙ খেয়ে অচেতন হয়ে থাকে, পথ চলতি মেয়েদের দেখে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় – অঙ্গভঙ্গি করে, পার্টির দাদাদের ডাকে ভিড়ে যায় স্লোগান দিতে দিতে রাজনৈতিক মিছিলে। তারপর চোখের ইশারায় হাঙ্গামা শুরু করে, ঐ ওদের সঙ্গেই মিশতে শুরু করেছে লাট্টু।

দেবুকে বলেও কোন লাভ হয় না। দেবু গা করে না। উল্টে ঝুমড়িকে বলে –

“তোর ছেলে তুই বোঝ”

ঝুমড়ি রেগে ওঠে –

“সোহাগ করার সময় মনে ছেল না”

দেবু একটা খারাপ গালাগাল দিতেই ঝুমড়ি তেড়ে যায় দেবুর দিকে।

দেবু মুহূর্তে দরমার দরজা ঠেলে বেরিয়ে ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

গজগজ করতে থাকে ঝুমড়ি, দেবুর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে সে।

দেওয়াল ঘেঁষে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ঝুমড়ির চার বছরের মেয়েটা ।

আর নিজের হাতের উলকিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে বুড়ি ।

****

দেবুর কোন বাঁধা ধরা কাজ নেই, যখন যা পায় তাই করে। রোজ সে কাজের সন্ধানে বেরোয়েও না।

সেদিন সে বসে বসে বিড়ি টানে আর বিকেলের দিকে পাশের পাড়ায় জুয়ার আড্ডায় গিয়ে বসে। বেশিরভাগ দিনই সব খুইয়ে ঘরে ফেরে। ঝুমড়ি তখন মেয়েটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ছেলেটা আগেই খেয়ে শুতে চলে যায়। ঠাকুমার ঘরে সে ঘুমোয়। ঝুমড়ি থালায় রুটি সাজায় । দেবুকে রুটি তরকারি এগিয়ে দিয়ে শাশুড়িকে একটা রুটি আর একটু তরকারি দিয়ে আসে। বুড়ি এর বেশি আর খেতে পারে না। ঝুমড়ি বলে –

"সারাদিন গতর নাড়াবে না, বসে বসে শুধু গিলবে।"

বুড়ি কানে শুনেও না শোনার ভান করে থাকে। বউটা ঝগড়ুটে হলেও মন বলে একটা কিছু আছে। সবকিছু একা হাতে সামলায়। বুড়িকে খেতেও দেয় সময়ে সময়ে। শুধু খুব রেগে গেলে মাঝে মাঝেই খেতে দিতে ভুলে যায় নাকি ইচ্ছে করে দেয় না তা ঠিক বুঝতে পারে না বুড়ি, সেদিন আর খাওয়াই হয় না সেভাবে। একগাল মুড়ি জল খেয়েই দিন কেটে যায় ।

ছেলে দেবু, সেও হয়েছে তার বাপের মত। মদ আর নানা নেশায় মেতে থাকে। দেবুর বাপ কম অত্যাচার করেনি বুড়ির ওপর।

বাপ-মায়ের ঘরে বুড়ির এত দুর্দশা ছিল না। বুড়ির ভাল নাম ছিল দুর্গা। ওর বাবা তারকেশ্বর লোকালে ঘুরে ঘুরে বাদামভাজা চিঁড়েভাজা বিক্রি করে সংসার চালাত। আর যাইহোক মানুষটা সৎ ছিল। বুড়িদের একটা টালির চালের ছোট্ট বাড়ি ছিল শ্রীরামপুর স্টেশন ঘেঁষে। সে বাড়িতে বাবা, মা দাদা আর ঠাকুমার সঙ্গে থাকত বুড়ি।

বুড়ির মা খুব ভাল উলকি আঁকতে পারত। আশেপাশের অনেকেই এসে উলকি আঁকিয়ে নিয়ে যেত বুড়ির মায়ের কাছ থেকে।

যেদিন প্রথম বুড়ির হাতে উলকি এঁকে ওর নাম লিখে দিয়েছিল মা আর বলেছিল –

"তোর হাতে মা দুগ্গাকে দিলাম।"

সেদিন বুড়ি অর্থ না বুঝলেও মা হাতে উলকি এঁকে দেওয়ায় খুব খুশি হয়েছিল সে। পরের দিন স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখিয়েছিল খুব আনন্দ করে।

বুড়িদের সংসারে একটা লক্ষ্মীশ্রী ছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্মী হঠাৎই বিদায় নিল বুড়ির বাবা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়ার পরেই।

বুড়ির মা সে শোক সহ্য করতে পারে নি। ছ'মাসও কাটেনি। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল ।

ঠাকুমা সব সহ্য করেও বুক দিয়ে দুই ভাইবোনকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। হঠাৎ করে একদিন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল বুড়ির দাদা। বুড়ি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু খোঁজখবর করেছিল বটে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের হাতের উলকিটার দিকে তাকিয়ে থাকত সে, মায়ের স্পর্শ অনুভব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সেদিনও এরকমই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুম ভাঙল যখন তখন অনেক রাত। চারিদিকে এত অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা, কেঁপে উঠেছিল বুড়ি। অন্ধকার ভেঙে দৌড়ে গিয়েছিল ঠাকুমার ঘরে। কোথাও আলো জ্বালা হয় নি। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে বুড়ি দেখেছিল দেওয়ালের দিকে মুখ করে ঠাকুমা ঘুমিয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে ঠ্যালা মেরে ডাকতে গিয়েছিল বুড়ি, খুব খিদে পেয়ে গেছে যে।

ঠাকুমার গায়ে হাত দিয়েই ছিটকে সরে এসেছিল সে। এই বরফশীতল স্পর্শের অর্থ বুড়ি ততদিনে বুঝতে শিখেছিল।

****

পড়াশোনার পাঠ তো কবেই চুকেছিল। একা একা কিভাবে জীবন কাটবে – এ চিন্তায় যখন দিশেহারা বছর ষোল-সতেরোর বুড়ি, তখনই কোথা থেকে যেন উদয় হয়েছিল নিতাই।

বুড়িও চাইছিল বাঁচতে। একটা অবলম্বন খুঁজে পেতে চাইছিল সে। একমাসের মধ্যেই কালিঘাটে বিয়ের পাট চুকিয়ে নিতাইয়ের হাত ধরে সে উঠে এসেছিল কলকাতার রাস্তার ধারের এই উদ্বাস্তু ঝুপড়িতে।

প্রথমের কয়েকটা দিন ভালই কেটেছিল বুড়ির। নিতাইয়ের সংসারে কেউ ছিল না। বুড়ি চেয়েছিল নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে তাদের সংসার। বাধ সাধল নিতাইয়ের মদ জুয়া সাট্টার নেশা। দিনে দিনে রূপ বদলাতে লাগল নিতাইয়ের।

শ্রীরামপুরে বুড়ির যা কিছু ছিল নিতাইয়ের কথায় বিশ্বাস করে সব বেচে টাকা তুলে দিয়েছিল ওর হাতে। বুড়ি যখন বুঝল সে নিঃস্ব তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। দেবুর জন্মের পরে নিতাইয়ের অত্যাচার আরও বাড়ল। তার নেশার টাকা না পেয়ে বুড়িকে সে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটাতেও পিছপা হত না।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে তাকিয়ে থাকত বাঁ হাতে মায়ের এঁকে দেওয়া উলকিটার দিকে।

মা বলেছিল দুগ্গা দিল তার হাতে। মনে মনে সে বলত – তাহলে এত কষ্ট কেন মা ?

দেবু বড় হতে লাগল। কাছের একটা স্কুলে কোনরকমে ভর্তি করিয়েছিল বুড়ি। সংসারের প্রয়োজনে, নিতাইয়ের নেশার টাকা জোগানর দায়ে, চ্যালাকাঠের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাকে বেরোতে হল ঠিকেঝিয়ের কাজ করতে। উদয় অস্ত খেটেও একটু সুখ, একটু শান্তির খোঁজ পায় না বুড়ি। এরমধ্যে ছেলে যে কখন স্কুল ছেড়ে বাপের পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে তা টের পায় নি বুড়ি।

সাট্টার আড্ডা থেকে নিতাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ বেধরক পিটিয়েছিল সেবার। মদ-গাঁজায় ভেঙে পড়া শরীরে সে ধকল আর সহ্য করতে পারেনি নিতাই।

নিতাই মরে যাওয়ার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেবু কোথা থেকে ঝুমড়িকে বিয়ে করে এনেছিল।

হতভম্ব বুড়ি কিছু বোঝার আগেই দুজনে ঘরে ঢুকে দরমার দরজাটা বুড়ির মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল। বুড়ি সামনে থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

পোয়াতি ঝুমড়িকে বুড়ি ভালই যত্ন আত্তি করেছিল। তারপর নাতির মুখ দেখে আনন্দিত হয়েছিল খুব। এরই মধ্যে দেবুর মদ খেয়ে মাতলামো নিয়ে শুরু হয়েছে অশান্তি ঝগড়া। ঝুমড়ি অত্যন্ত মুখরা আর বদ মেজাজি তা টের পেয়ে বুড়ি একটু সরেই এসেছিল ওদের সংসার থেকে। দূরে থাকাই ভাল।

দেবু অতটা পেরে ওঠে না ঝুমড়ির সঙ্গে। ঝুমড়ির রণচন্ডী মূর্তিকে সে কিছুটা হলেও ভয় পায়। তবুও স্বভাব বদলাতে পারে না সে।

গতকাল রাতেও মদ খেয়ে এসে মাতলামো করছিল দেবু। ঝুমড়ি একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে পিটিয়ে বের করে দিয়েছিল ঘর থেকে। খানিকটা গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল দেবু। এখনো ওখানেই পড়ে আছে ছেলেটা। বুড়ির ক্ষমতা নেই তুলে আনার, সে তাই চুপচাপ বসে আছে দেওয়াল ঘেঁষে। ঝুমড়ি সকালে উঠে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে ছেলেটাকে আগে স্কুলে দিয়ে এসেছে। আজ সকাল থেকেই সে গজগজ করতে শুরু করেছে। বুড়ি জানে, এ এখন চলবে।

হাঁড়িতে ভাত চড়িয়ে একবালতি জল নিয়ে গিয়ে দেবুর ওপরে ঢেলে দিল ঝুমড়ি। গায়ে জল পড়তেই নড়েচড়ে উঠল দেবু। পথ চলতি মানুষ বিরক্তিতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। একটু পড়ে দেবু রাস্তা থেকে উঠে বুড়ির পাশে গিয়ে বসল।

****

রাতে বুড়ি ঘুমিয়ে ছিল তার দরমার ঘরের মেঝেতে। হঠাৎ উত্তপ্ত হলকায় তার ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের মধ্যে চোখ মেলে প্রথমটায় সে কোন কিছুই ঠাওর করতে পারল না। ধরফর করে উঠে বসতেই খেয়াল হল লাট্টু কোথায় গেল ? সে তো তার পাশেই শুয়ে থাকে, সেখানে তো নেই।

হঠাৎ মনে হল, সবাই তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। এবার সে আগুনে দগ্ধে মরবে। বুড়ির মনে পড়ল তার বাবা, মা, দাদা, ঠাকুমার কথা। একে একে সকলেই তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। মনে পড়ছিল স্বামীর হাতে মার খেতে খেতে সে যখন অচৈতন্য হয়ে পড়ত তখনও যেমন কেউ আসত না তাকে বাঁচাতে, আর আজ ঘর জ্বলছে আগুনে, কেউ আসেনি তাকে বাঁচাতে। সবাই তাকে ফেলে পালিয়েছে। আবার অনেক বছর পর বুড়ির দুচোখ ভরে এল জলে, এতই অপ্রয়োজনীয় সে এ সংসারে।

ঠিক সেই সময় কে যেন আগুনের মধ্যে দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আপাদমস্তক কালো কম্বলে ঢাকা । কম্বলের ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে বুড়িকে টেনে তুলে নিজের কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে হিঁচড়ে বের করে আনলো ঘরের বাইরে। তখন আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঝুপড়িতে। কিভাবে আগুন লেগেছে কেউ জানে না প্রচন্ড হইহুল্লোর চেঁচামেচির মধ্যে কে কি বলছে কিছুই ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বালতি বালতি জল এনে সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত। বুড়ি ঘাড় ঘোরাতেই দেবু আর তার নাতি নাতনিকে দেখতে পেল। কিন্তু ঝুমড়ি কোথায় ? এপাশ ওপাশ ঘাড় ঘুরিয়ে কোথাও ঝুমড়িকে দেখতে পেল না বুড়ি।

বুড়ি দেখল কালো কম্বল জড়ানো সেই মানুষটা, যে তাকে আগুনের মধ্যে থেকে বের করে এনেছে সে একটা বছর দুয়েকের বাচ্ছাকে কোলে করে এদিকেই আসছে। বাচ্ছটার মা হাঁউমাঁউ করে কাঁদছিল। কম্বল জড়ানো মানুষটা এগিয়ে এসে মায়ের কোলে তার সন্তানকে তুলে দিয়ে এক হ্যাঁচকায় গা থেকে কম্বলটা খুলে ফেলে হাঁপাতে লাগল।

না, কোন পুরুষ নয়, একজন নারী। কম্বলের টানে মাথার খোঁপাটা খুলে গিয়ে পিঠ পর্যন্ত ঝুলছে কোঁকড়ানো চুল, কপালে ঘামের সঙ্গে আটকে আছে বেশ কিছু চুল। সিঁথিতে লম্বা সিঁদুর। জ্বলন্ত ঝুপড়িগুলোর আগুনের আঁচ এসে পড়েছে তার মৃদু হাসি লেগে থাকা মুখের ওপর। যেন এক স্বর্গীয় আভা শোভা পাচ্ছে তার সারা মুখ জুড়ে।

আরে ! ঝুমড়ি !

বুড়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ঝুমড়ির দিকে।

মা, বুড়ির হাতের উলকিতে তার নাম লিখে বলেছিল – "মা দুগ্গাকে দিলাম তোর হাতে।"

বুড়ি এত দিনে সাক্ষাৎ দুগ্গার সন্ধান পেল।

“Kolkata” ... tumio hete dekho Kolkata ... jabe ki aamar sathe ...
My humble tribute to our beloved kolkata
In watercolour on paper

সৌমিত্র চক্রবর্তী

বড়ন্তি বেড়ানো

পর্ব এক

আমার, বউয়ের আর ছেলের একটা বিরাট গুণ আছে। আমরা বেড়ানোর আগেই অনেক জায়গা বেড়িয়ে ফেলি। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবেনা যে আমরা এক কথায় একটা বেড়ানোর জায়গা ঠিক করে ফেলেছি। ধরুন, বেড়াতে যাওয়া ঠিক হলো। শুরুটা হলো কাজিরাঙা দিয়ে, আলোচনা গড়াতে গড়াতে তিন মক্কেলের কেউ ক্যালিফোর্নিয়া সাজেস্ট করে ফেললো, তারপর শেষমেশ দেখা গেলো কালিম্পংয়ের ট্রেন ধরছি। সিঙ্গাপুর যেতে গিয়ে সিঙ্গুরের ধাবা পৌঁছনো কিংবা কাশ্মীর যেতে গিয়ে কাশী জলভাত আমাদের কাছে।

এবারই যেমন। গুজরাট, শান্তিনিকেতন, রাজস্থান, পুরী হয়েও যখন কিছুই ঠিক হলনা, তখন ভাবা হল পুরী না হয় তো পুরুলিয়াই সই ! পুরুলিয়ার কোথায় যাবো ? কেন বড়ন্তি ! সেখানে এক বসন্তে যেতে যেতেও যাওয়া হয়নি, না হয় বর্ষাতেই যাওয়া যাক। খোকা যাবে পুরুলিয়া, সঙ্গে যাবে কে ? না, কোমর বাঁধার জন্য কোনও হুলো বেড়াল নেই আমাদের ঘরে, কিন্তু বন্ধু গোস্বামীদারা আছে। যেখানেই যাই, দল পাকানোটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের দুই পরিবারের। আর সঙ্গে আমার শাশুড়িঠাকুরুন তো আছেনই। বেচারি পায়ের ব্যথার চোটে যাওয়ার ব্যাপারে যত না না করেন, তার নাতিটি ততই একেবারে নানাসাহেবের স্টাইলে সব যুক্তি কচুকাটা করে। মাঝরাত অবধি প্রবল ধস্তাধস্তির পর অতএব তাঁকেও দলে সামিল হতেই হলো। শেষ পর্যন্ত এই গত শুক্রবার মানে তিন তারিখে রওনার দিন স্থির হলো।

পর্ব দুই

বেরোনোর কথা ছিল সকাল ছটায়। কিন্তু যেহেতু আমরা বাঙালি, তাই কিছুতেই সাড়ে ছটার আগে বেরোলুম না আর এই দেরীর জন্য আমি দোষ দিলুম ছেলেকে, ছেলে তার মাকে আর ছেলের মা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, "তুমি বড্ড দেরী করো"। যাই হোক, সেই অভিযোগ আর পনেরো লিটার মিনারেল ওয়াটার মাথায় নিয়ে গাড়ি চেপে বসলুম। মিনারেল ওয়াটারটা এক্সক্লুসিভলি আমার জন্য, সদ্য টাইফয়েড ফেরত কিনা ! গাড়ি গড়গড়িয়ে চলল, থামল গিয়ে বড়া। সেখানে গোস্বামীদার গাড়ি আসবে। সে আসাতে মারুতিতুতো দুই গাড়ি সোজা শক্তিগড়। আগে থেকেই ঠিক ছিল শক্তিগড়েই প্রাতরাশ করে শক্তি বাড়াতে হবে। সবাই দক্ষিণী দোসা আর ইডলি খেতে বসে গেল, শুধু আমি আর আমার পুত্র ছাড়া। পুপু ওই সাড়ে আট সকালেই রুটি আর চিকেন কষা খেতে শুরু করল। আমি বরাবর দেখেছি, চিকেন দেখলেই ওর মেজাজটা কেমন যেন চিকন হয়ে যায়। ভোর থেকে মাঝরাত, মুরগীর মোহব্বতে যখন তখন পড়তে পারে ও। মুরগী মানে কুক্কুট ওর কাছে অন্নকূটের সমান। আর আমি ঠিক কাক দেখা পেঁচার মতো মুখ করে টিফিনবাক্স খুলে চিবোতে শুরু করলুম আদিখ্যেতায় নেতিয়ে পড়া চারখানা টোস্ট। শাশুড়ি অবশ্য লোক ভালো, জামাইকে একখানা ছোট পিস ইডলি দিলেন। আমি একবার জনসন আরেকবার জনার্দনম হয়ে পর্যায়ক্রমে টোস্ট আর ইডলি গলাধঃকরণ করতে লাগলুম। এবার আবার যাত্রা শুরু। মারুতিতুতো ভাইদের মধ্যে যাত্রী চালাচালি হল, গ্যাঁজানির সুবিধের জন্য একটিতে তিন নারী, আরেকটিতে চার পুং।

পর্ব তিন

সাঁই সাঁই করে গাড়ি যত এগোতে লাগল, মন ততোধিক জোরে পেছনে ছুটতে লাগল স্মৃতির পিঠে চেপে। রাণীগঞ্জ আসছে যে ! এই রাণীগঞ্জেই যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়বার সময় প্রতি গ্রীষ্মে কাটিয়ে যেতাম এক-এক মাস। কি সব

নাম জায়গার! পান্ডবেশ্বর, কুনোস্তোরিয়া, কাজোরা, সাঁকতোরিয়া – নামগুলো এখনও শিরায় শিরায় ঝংকার তোলে। তখন বাইশ-তেইশ। জীবনে মোবাইল ফোনের সামান্যতম পদশব্দও নেই। আমরা কেমন আছি সে খবর টেলিগ্রাফে যেত কোল ইন্ডিয়া অফিসে, সেখান থেকে খবর যোগাড় করে আমাদের অডিট ফার্ম বাবা-মা'দের জানিয়ে দিত আমরা ভালো আছি। খনির গহন গভীরে ঈষৎ ভীত অথচ কৌতূহলী পদচারণা, আগের দিনের শুকিয়ে কাঠ অজয় নদকে এক রাতের বন্যায় দুর্দান্ত হয়ে উঠে লরি ভাসিয়ে দিতে দেখা, ভোর সাড়ে তিনটেয় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শেষ রাতের চাঁদকে একা কাছে পাওয়া, প্রথম মারুতি ভ্যান চড়া – এসব তো এখানেই। বন্ধুদের মদ খেতে শেখা, জুয়ায় হাত পাকানো, নানা নিষিদ্ধ আকর্ষণের হাতছানি – দিনগুলো যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়তে লাগল প্রতিষ্ঠিত সৌমিত্রের গাড়ির চাকার গায়ে। বারবার ঢালা পিচ রাস্তায় মধ্যবিত্ত এক বছর বাইশের যুবক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "তুই ভীতু হয়ে গেছিস শালা ! হিসেবী হয়ে গেছিস ! তুই আর তোর নস, তুই সমাজ, পরিবার, কেরিয়ারের হাটে বিকিয়ে গেছিস। দ্যাখ আমার দিকে চেয়ে, আজও অরিজিনাল মাল একদম, শুধু তোর কাছ থেকে দূরে সরে গেছি"।

রাণীগঞ্জ পাঞ্জাবী মোড়ের জ্যামে ফাঁসতে ছিটকে হারিয়ে গেল ছেলেটা মানুষের ঘিঞ্জি ভীড়ে। আর আমি সেই ভীড় পেরিয়ে, আরও কতো নাম জানা – না জানা জায়গা পেরিয়ে এগোতে লাগলাম আমার বুক করা রিসর্টের দিকে, বড়ন্তির দিকে, কি জানি, যদি সেখানে সূর্যাস্তের মায়াঘেরা হ্রদে পাশে এসে একবারও দাঁড়ায় বাইশ বছর ! জীবন মানে তো এখন তাকেই আরেকবার ছুঁতে চাওয়া !

পর্ব চার

রিসর্টে ঢুকে মনটা শরিফ হয়ে গেল। সবুজ একটা বড় লন, তার চারপাশ দিয়ে পায়ে হাঁটার পথ আর পেছনে থাকবার বাড়িটি। তারই একতলা জুড়ে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত। রিসর্টের ম্যানেজারমশাই ভারী ভদ্র আর নম্রভাষী। পরে অবশ্য দেখলুম, শুধু তিনি নন, ডেপুটি ম্যানেজারমশাই, রাঁধুনি মশাই, কাজের মাসিরা আর আমার ছেলের বয়সী যেসব স্থানীয় বাচ্চারা অতিথিদের সহায়তা করে ওখানে, তারা সবাই ভারী মিষ্টি স্বভাবের আর হাসিমুখের।

আপন খেয়ালে কি বেখেয়ালে

গোস্বামীদার জন্য বরাদ্দ ঘরে ঢুকে দেখি এক চমক। বারান্দা থেকে নজরে আসছে টলটলে এক জলরাশি, যেন কতোদূর অবধি ছড়িয়ে থাকবার আভাস তার চোখে। ও মা! ওই বুঝি বড়ন্তি লেক ! বড্ড মায়াবী তো ! এমনটা সবে ভাবছি, রিসর্টের আনন্দ সুলুক দিলো রিসর্টের নিজস্ব ওয়াচ টাওয়ারে যাওয়ার। তাতে উঠে দেখি, ঠিকই ভেবেছিলুম। যেদিকে চোখ মেলি, লেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আর সে' লেক গিয়ে মাথা গুঁজে দিচ্ছে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের কোলে, যেন নতুন লোক দেখে তার ভারী লজ্জা করছে। কেন জানিনা, আমার হঠাৎ সবুজ দ্বীপের রাজা সিনেমাটার কথা মনে পড়ে গেল। সেই যে সমুদ্র আর তার কোলে এক রহস্যময় দ্বীপ মাথা তুলে ! মনে হল, ওই সবুজ পাহাড় যেন তেমনই কোনও রহস্যে গড়া আর ভরা। এক্ষুনি দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠবে ঢাক আর মস্ত একটা কান্ড হয়ে যাবে !

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাওয়ার আগে

দুপুরের খাওয়াটি হল চমৎকার – ভাত, শুক্তো, ডাল, ভাজা, মুরগীর ঝোল, চাটনি। ভোর পাঁচটা থেকে উঠে লাফালাফি করেছি বেড়াতে যাওয়ার নেশায়, এখন এমন তোফা রান্না পেটে পড়তেই মন বলে উঠল, "একটা ভাতঘুম হয়ে যাক।" তো হয়েই যাক ! সেই ঘুম থেকে উঠে ঠিক হল বড়ন্তি লেকে সূর্যাস্ত দেখতে যাওয়া হবে। অতএব, আমি আর গোস্বামীদা পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। বউরা গাড়িতে চলল আমার শাশুড়িকে সঙ্গ দিতে দিতে। আর ছেলেদুটো ? মহা জাঁহাবাজ ! অমন বোকা সেজে থাকে বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে বাপেদের হাটে বেচে আবার কিনে ফেলতে পারে। বললুম, "চ', হাঁটবি।" বলে কিনা, "মা-দের একলা ছাড়া উচিত হবেনা।" এই বলে গাড়িতে চড়ে বসল।

হাঁটতে শুরু করেই দেখি এক আদিবাসী গ্রামে ঢুকে পড়েছি। সেই গ্রাম পেরিয়ে বাঁ হাতের একটা রাস্তা ধরে খানিকটা এগোতেই দেখি লেক আর আমরা মুখোমুখি। সূর্যদেব তখন সবে দিনের ডিউটি কমপ্লিট করে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছোচ্ছেন খুশী মনে। আর তাঁর সেই খুশীর রেশ গলানো সোনার মতো উপচে পড়ছে লেকের জল জুড়ে। সবুজ লেক দেখতে না দেখতে সোনালী, যেন গায়ে হলুদ হচ্ছে! ওদিকে পাহাড় তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে জলের বুকে। সূর্যাস্তের আলো, লেকের জল, পাহাড় সব মিলিয়ে সে এক মস্ত কবিতা লেখা হয়ে চলেছে তখন প্রকৃতি জুড়ে। সে কবিতা ক্যামেরায় আঁটাবে কি ভাষায় বর্ণনা করবে, মানুষের তৈরি সভ্যতার সাধ্য কি ! সে কি আর বানানো কিছু ? সে যে অমনটাই হয়ে আসছে চিরটাকাল ধরে। রোজই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা আর রাত্তির জুড়ে লেখা হয়ে চলেছে অমন শত সহস্র কাব্য, কখনও সূর্যাস্তের মায়াবী আলোয়, কখনও নাম না জানা পাখির ডাকে, কখনও বা খেয়ালখুশী বৃষ্টিধারায়। ভাবতে ভাবতে দেখি ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি এসে হাজির সে মেহফিলে জলতরঙ্গ বাজাতে। কানে আর মনে তার সরগমের রেশ ছুঁইয়ে রিসর্টে ফিরে এলাম।

তারপর ? তারপর আড্ডা হল, খাওয়া হল, আর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া হল। কাল আবার সকাল সকাল অযোধ্যা পাহাড় যেতে হবে যে !

পর্ব পাঁচ

সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। অন্য কারও নয়। শুধু আমার আর প্রকৃতির। ঘরের বাইরে এসে দেখি, হাওয়ায়, পাতায় আর পাখির কূজনে ফিসফিসে এক আড্ডা বসেছে চারধারে। আমার ঘরের বাইরে চমৎকার এক খড়ে ছাওয়া বসবার জায়গা ছিলো। সেখানে বসে একান্তে প্রভাতী ধ্যান সেরে নেওয়া গেলো। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লুম রিসর্ট ছেড়ে। রিসর্টের সামনের পথ দু'চার পা গিয়েই উঁচু হয়ে মিশেছে চওড়া রাস্তায়। সে রাস্তার বাঁদিক বরাবর গেলে কালকের মতো পৌঁছনো যাবে লেকের ধারে। একবার ভাবলুম, যাই, দেখা করে আসি। তারপরেই মনে হল, যেতে হলে তো সেই আদিবাসী গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সে গ্রামের বাসিন্দারা হয়তো উঠে পড়েছেন এতক্ষণে, শুরু হয়ে গেছে তাঁদের রোজকার জীবন। কেন মিছিমিছি তাঁদের সেই যাপনকে বিরক্ত করতে যাওয়া ? এমনিতেই তো তথাকথিত সভ্যতা প্রতি মুহূর্তে পর্যটন আর উন্নয়নের নামে তছনছ করে ওনাদের নিভৃত, একান্ত থাকাটুকুকে। আমি না হয় তা না-ই করলুম তাঁদের এই নিজস্ব সময়টিতে। আমি ডানদিকের পথ ধরলুম। দু'দিকে হালকা-গভীর বন, বড়ন্তি পাহাড়ের আড়াল থেকে আড়মোড়া ভেঙে আবছায়া মেঘ ভাঙতে শুরু করেছে সূর্যকিরণের দল, কখনও-সখনও চলে যাচ্ছে একটা-দুটো সাইকেল, তাদের আরোহীরা আলগা কৌতূহলী দৃষ্টি বিলিয়ে দিচ্ছেন আমার হঠাৎ অস্তিত্বে, আমি চলেছি। কোথায়, কতোখানি জানিনা। হয়তো পায়ে হেঁটে সামান্যই, কিন্তু মনে মনে বহুদূর ! দেখি রাস্তার ওপর কি যেন লেখা ইঁটের টুকরো দিয়ে। মোরগের লড়াইয়ের বিজ্ঞাপন। এখানে হোর্ডিং লাগেনা, বিলবোর্ড লাগেনা, নেই গগনচুম্বী প্রচারের প্রয়োজন, সামান্য ইঁটের টুকরোর ঘোষণাই যথেষ্ট আনন্দযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য।

খেয়াল হলো, আজ অনেকটা পাড়ি দিতে হবে। ফিরতি পথ ধরে রিসর্টে ফিরে দেখি দলের অন্যরা প্রস্তুতি শুরু করেছে। জলখাবার খেয়েই বেরোনো হবে। জলখাবারে কি ? লুচি ! আহা ! স্বর্গীয় ! মনোমুগ্ধকর ! এ'সব সবে ভাবতে শুরু করেছি, মনে পড়ল টাইফয়েড ফেরতের ভাজাভুজি কম খাওয়ার নিদান হাঁকা আছে। অতএব, করুণ মুখে প্রশ্ন করতেই হল দুটো রুটি পাওয়া যাবে কিনা।

অতঃপর, আমার চোখের সামনে সব ব্যাটা মীরজাফর কচমচিয়ে লুচি খেতে লাগল আর আমি গরুর জাবর কাটবার স্টাইলে রুটি চিবোতে লাগলুম। কি দুর্দশা ! তখন যদি জানতুম, দুর্দশার এই সবে শুরু ! এ তো ট্রেলার। পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত !

পর্ব ছয়

গাড়ি করে রঘুনাথপুর যেতে যেতে দেখি বাঁদিকে চিহ্ন দেওয়া আছে জয় চন্ডী পাহাড়ে যাওয়ার। ওরেব্বাস! জয় চন্ডী পাহাড় মানে তো সেই হীরক রাজার দেশের পাহাড়টা যেখানে লুকিয়ে ছিলো উদয়ন পন্ডিত ! আজ তো হবেনা, কাল যাবো ওখানে।

তিনঘন্টার ওপরের পথ, কাজেই চালাও গান ! সকালবেলা, ফুরফুরে আবহাওয়া, মাঝে মাঝে মেঘেরা টুকি বলেই সরে যাচ্ছে, দুদিকের মাঠ আর জমি ভীষণ রকমের সবুজ। ভাবলুম, একটু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে হয়। তা পুপু শুনলে তো! সে আমায় অরিজিতের গলা কোনটা, হানি সিংয়ের গলা কোনটা এ'সব উদাহরণসহ বোঝাতে শুরু করে দিল। গোস্বামীদার একটা সুবিধা আছে, যখন তখন গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অতএব ও তাতেই মন দিল। আর বেটা মানে গোস্বামীদার ছেলে ঘুঘুর মতো থম মেরে বসে রইল। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল কারণটা। দুমদাড়াক্কা গান শুনতে শুনতে মনটায় যখন রকস্টার ভাব এসে গেছে, পুপু হঠাৎ শিফট করল রফিসাহেবের সফট মেলোডিতে। মানে ছোঁড়া আমাকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেবেনা আর কি !

সবুজ তারুণ্য আর ধূসর প্রৌঢ়ত্ব

পথে তেল নিতে দাঁড়াতে গাড়ি পাল্টে আমি অন্য গাড়িতে। এবার অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠা শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গে যে এতো সুন্দর একটা সবুজ পাহাড় আছে এদিকটায়, পুরুলিয়া না এলে জানা হত না। সত্যি বলতে এ' বছর বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া যেভাবে আমাকে মুগ্ধ করল, তা অনেক তাবড় জায়গাও করতে পারেনি। হঠাৎ মনে হল, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু দেখার বৃত্ত বোধহয় সম্পূর্ণ হলো এতোদিনে।

অযোধ্যা হিলটপে পৌঁছে একটা চমৎকার হোটেল পেয়ে গেলাম যার রেস্তোঁরাতে দুপুরের খাওয়াটা সারা যেতেই পারে। গরমাগরম ভাত-মাংস সবে সাঁটাতে শুরু করেছি, দেখি বেটা উঠে পড়ল। কি হল ? জবাবে বোঝা গেল গাড়িতে ওর গ্যাঁট মেরে বসে থাকবার কারণ। পটি! এদিকে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। হোটেলে পাম্প খারাপ, তাই জল নেই। তবে একটা ঘর খুলে দিলো ওরা। অতএব বেটা আমার স্টকের মিনারেল ওয়াটার নিয়ে চলল খালাস হতে। ইতিমধ্যে আমি তখন বিপদের আঁচ পেতে আরম্ভ করেছি। কি বিপদ ? ওই তো, বেটার যা বিপদ তাই-ই ! কিন্তু বলি কোন মুখে ? একে তো থাকতে নয়, শুধু খেতে এসেছি, তার ওপর জল না থাকা সত্বেও ঘর খুলে দিয়েছে ছেলেটার বিপদে, আবার আমার নিজেরটা ! অতএব পেটের দুঃখ পেটেই চেপে রেখে বীরপুরুষের মতো বেরিয়ে পড়লুম বাকি ঘোরাঘুরি কমপ্লিট করতে।

পর্ব সাত

প্রথম গেলুম ময়ূর পাহাড়। দেখি বেশ খানিকটা সিঁড়ি ভাঙতে পারলে এক হনুমান মন্দিরে যাওয়া যাবে। সদ্য পেট পুরে ভাত-মাংস খাওয়া পার্টির তখন আর সিঁড়ি ভাঙবার ইচ্ছে নেই। আর আমার পেটে তো বর্ষার আভাস। তাই নিচ থেকেই বজরঙ্গবলীকে নমস্কার জানিয়ে সোজা মার্বেল লেক। সেটা ভারী সুন্দর জায়গা। ওপর থেকে দেখলে জব্বলপুরের মার্বেল রকের ট্রেলার মনে হয়। আমার ভারী পছন্দ হল জায়গাটা। আরেকটা লেকে যাওয়ার পথ বন্ধ, সুতরাং ফেরবার পথ ধরা হল। সবাই গল্পে মশগুল, আমি খালি হিসেব করে চলেছি কতক্ষণে বড়ন্তি পৌঁছোব। হঠাৎ

দেখি পাশাপাশি দুটো হোটেল। আর চান্স নেয় ? সোজা প্রথম হোটেলে, "দাদা, একটু পটি করতে দেবেন ? পয়সা দেব।" প্রথম হোটেল বললে, "জায়গা নেই"। কিসের জায়গা নেই রে ভাই ? হোটেলে পটি করবার জায়গা নেই ? তা নয়, জানা গেল কোনও ঘর খালি নেই। অতএব হোটেল নম্বর টু। এরা শুনেই একেবারে চমৎকার একট ঘর খুলে দিলো। কাজ-কর্ম সারা হল, ঘরভাড়া দেওয়ার কথা বলতেই হাতজোড় করলেন, "ছি ছি দাদা, পরেরবার এদিকে এলে আমার হোটেলে থাকবেন, তাহলেই হবে"। আহা ! বড্ড ভালো লোক !

তখন শেষ বিকেল। পুরুলিয়া শহর ষোল কিলোমিটার আর বড়ন্তি আশি কিলোমিটার দূরে। একটা চা-কাম-মদের দোকানে চা খেতে দাঁড়াতে থমথমে মুখে এগিয়ে এলেন গোস্বামীদার চালক তোতন ভাই, "মোবিলের কাঁটা শূন্য দেখাচ্ছে"। সে কি ! দেখা গেল, কোথাও ঠোক্কর খেয়ে মোবিল ট্যাংকে ইয়াবড় ছ্যাঁদা, তাতেই সব মোবিল পড়ে গেছে। দোকান মালিক হদিশ দিলেন কয়েক কিলোমিটার দূরের এক মোবিল কেনবার আস্তানার। মোবিল এলো, ছ্যাঁদা নাট দিয়ে বুজিয়ে সে মোবিল ঢালাও হল, ছরছরিয়ে সবটা পড়ে গেল। আবার দোকান যাওয়া হল, এবার মোবিলের সঙ্গে এম সিল কিনে আনা হল। এম সিল দিয়ে ফুটো বোজানো হল। তারপর তা শক্ত হওয়ার অপেক্ষা শুরু হল। এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। দোকানটা চায়ের দোকান কম আর মদের দোকান বেশী হয়ে আসছে ক্রমশঃ। হাইওয়ের ওপর, তারপর উইকএন্ড, জামসেদপুর বেশী দূর নয়। আস্তে আস্তে বাইক আর লোকের ভীড় বাড়ছে। একজন পাশে বমি করল। তখন সবাইকে আর সব কিছুকে সন্দেহজনক মনে হতে শুরু হয়েছে। ঠিক হল, আর অপেক্ষা নয়। মোবিল ঢেলে জয়গুরু বলে রওনা হওয়াই ভালো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ও গাড়িতেই আবার তেল কমে এসেছে। কথা হল যে গোস্বামীদার গাড়ি পাঁইপাঁই করে ছুটবে, পথে পুরুলিয়া শহরে তেল নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেলে পৌঁছবে। আমরা পেছনে চললাম। ওদের দেখতে পাচ্ছি না। পুরুলিয়া শহর পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠেছি আর আলোচনা করছি যে ওরা নিশ্চয় এতোক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে, এমন সময় গোস্বামীদার ফোন। পুরুলিয়া শহরে পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে দাঁড়িয়ে দেখা গেছে যে আবার মোবিল পড়ছে। কাজেই ওরা ওখানেই দাঁড়িয়ে। অতএব আমরা আবার গাড়ি ঘুরিয়ে খুঁজে খুঁজে ওদের কাছে। জানা গেল, গাড়ি সারতে রাত হয়ে যাবে। তখন ঠিক হল, গোস্বামীদা আর তোতন ভাই গাড়ি সারিয়ে নিয়ে আসবে, দরকারে রাতে শহরে থেকে যাবে আর মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে আমার গাড়িতে আমি ফিরে যাবো হোটেলে। এরপর যা হল তার জন্য মারুতি কোম্পানি আমাকে পুরস্কার দিতে পারে। ফ্যামিলি কার কাকে বলে আমরা দেখিয়ে দিলুম। সামনে রমেশের পাশে শাশুড়ি মা, পিছনে অনিন্দিতা, অনিন্দিতার কোলে বেটা, তারপর বৌদি সামনের দিকে হাফ ঝুলে, পাশে আমি অদ্ভুত একটা জ্যামিতিক অ্যাঙ্গেলে, পা আর মাথা আশ্চর্য রকমের কোণাকুণি আর পুপু আমার আর দরজার মাঝে ঠাসা। রাস্তা ভীষণ রকমের অন্ধকার, গাড়ি চলাচলও নেই বললেই চলে, আমি খালি ভাবছি টায়ার ফেঁসে গেলে কি হবে! গুগল ম্যাপ ভরসা করে চলতে চলতে অবশেষে সাড়ে ন'টার পরে হোটেলে। তবু স্বস্তি কোথায় ? আরেকটা গাড়ি যে এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে। অবশেষে রাত দশটায় মেরামতি শেষ করে রওনা দিলো সে গাড়ি। এগারোটা পনেরো অবধি দিব্যি মোবাইলে যোগাযোগ, তারপর হঠাৎ যোগাযোগ হারিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পৌনে বারোটায় পৌঁছতে জানা গেল, গোস্বামীদার মোবাইলে চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে কথাও বলতে পারছিল না আর গুগল ম্যাপ না দেখতে পারায় রাস্তা গুলিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। যাক, অবশেষে আবার সবাই এক হওয়া গেছে ! এই ভেবে শুতে যাওয়া হল। মাথায় অবশ্য রয়েই গেল, কাল বাকি দ্রষ্টব্য তাড়াতাড়ি দেখে বাড়ির পথ ধরবার কথাটা। গাড়ির মেরামতি যে নেহাৎই কাজ চালানোর মতো !

শেষ পর্ব

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই উবু হয়ে গোস্বামীদার গাড়ির সামনে। আবার মোবিল পড়ছে না তো ? নাহ, মাটি শুকনো। বেরিয়ে পড়লুম মর্নিং ওয়াকে। ফিরে এসে দেখি, গোস্বামীদা, রমেশ আর তোতন ভাই সব্বাই মিলে উবু হয়ে বসে পড়েছে গাড়ির সামনে। বোঝা গেল একই টেনশন চোরা গতিতে বইছে সবার মনে।

যাই হোক, জলখাবার খেয়ে রিসর্টকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। প্রথম গন্তব্য জয় চন্ডী পাহাড়। যেতে যেতে এক রেললাইন পেরোতে গিয়ে দেখি লাইনের দু'ধারে এমন করে কাশফুল ফুটে আছে যেন এক্ষুণি অপু আর দুর্গা ছুটে আসবে। খুব হিংসে হল ওই লাইন দিয়ে যে ট্রেন যায়, তার চালকের ওপর। ইস ! কি চমৎকার একটা দৃশ্যপটের মাঝখানে যাতায়াত তাঁর!

রেললাইনও জেনে গেছে পূজো আসছে

মহা খানাখন্দভরা রাস্তা পেরিয়ে যাওয়া গেল জয় চন্ডী পাহাড়ে। এটা আমি দুবরাজপুরেও দেখেছি। মামা-ভাগনে পাহাড় যেতে গিয়ে ভাঙা রাস্তার প্রকোপে গাড়ি অচল হওয়ার দশা ! জয় চন্ডী পাহাড় দেখে নিমেষে মনের মধ্যে সেই বিখ্যাত সব দৃশ্যের আনাগোনা। ভাবা যায়, ওটায় গুপী-বাঘার সঙ্গে দেখা উদয়ন পন্ডিতের ?

পরের গন্তব্য গড়পঞ্চকোট। যেতে যেতে গোস্বামীদা দেখাতে লাগল ভুল করে এই পথে কেমন করে চলে এসেছিল তারা। একটা কথা ভেবে বড় মজা লাগল। সময় আর পরিস্থিতি আমাদের আশপাশটাকে কেমন নিজের মতো করে সূচিত করে দেয়। কাল রাতে যেসব পথকে ভয়াবহ লাগছিল, আজ রোদে ধোওয়া সেই সব পথই বড় মায়া জড়ানো মনে হতে লাগল। মনে হল, আসলে আমাদের মনই ঠিক করে দেয় আমরা কোনটা কিভাবে নেব।

গড়পঞ্চকোট রাস মন্দির যাওয়ার পথে হঠাৎ এক জায়গায় ভ্রমনার্থীদের বেজায় ভীড়। দেখি, এক মস্ত পুকুর, তাতে কেবল পদ্মফুল আর পদ্মফুল ! কি অপূর্ব ! গ্রামের বাচ্চারা সেই ফুল তুলে আনছে আর বিক্রি করছে ভ্রমনার্থীদের। আমার কাছেও এলো দুই মেয়ে। গায়ে জামা নেই, পুকুরে বারবার নামতে হচ্ছে যে ! যোগাড় করতে হচ্ছে যে সংসার চালানোর খরচ ! – "কতো করে রে ?"

– "দশ টাকায় দুটো।"

– "দুর, কিছু জানিস না। দশ টাকায় একটা। কুড়ি টাকায় দুটো।"

নিমেষে রোদ ঝলমল হাসি। দুটো পদ্ম সাগ্রহে এগিয়ে এলো। এদিক থেকে তিরিশ গেল।

বাঃ! লজেন্স খেতে হবেনা বুঝি ! আবার কবীর সুমনের গান সত্যি হয়ে ওঠা – "তুই হেসে উঠলে সূর্য লজ্জা পায়"।

রাস মন্দিরের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই পিলপিলিয়ে গোটা পাঁচেক পুঁচকে। ওমা ! হাতে কি ওদের ? বাহ রে, খেজুর পাতা দিয়ে কি সুন্দর ফুল বানিয়েছে ! এই রে, কার থেকে নিই ? পুঁচকে বাহিনী আর আমার চটজলদি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল, সবার থেকে দুটো করে নেওয়া হবে। না হলে চলে কি করে ? এদিকে "গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে"। দেখতে দেখতে গাড়ির জানালার কাঁচের সামনে এক ডজন। দলের সবাই নেমে পড়েছে, শুধু আমি ছাড়া। নামব কি করে ? ঢাকা পড়ে আছি যে খেজুর পাতার ফুলে ! তারপর এক সময় কেনাবেচা শেষ হল, বিক্রেতাদের হিসেবে কম হয়ে যাচ্ছিল, তা শুধরোনো হল, সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হল। মন্দিরে পা রাখতে যাচ্ছি, সামনে এক বড্ড পুঁচকি, "আমায় একটা পুজোর জামা দেবে ?"

– "কি করে দেব রে ? সঙ্গে আনিনি যে !"

হতাশ মুখটা সামনে থেকে সরে গেল, কিন্তু হতাশার এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেল বুড়ো মনে। সেই থেকে চেষ্টা শুরু হল, যদি কোনওমতে ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারা যায় পুজোর কয়েকটা জামা। আপনাদের বলি, ঠাকুর দয়া করেছেন। একটি প্রথম সারির দৈনিকের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁরা পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার বাচ্চাদের কাছে পুজোর জামা পৌঁছে দেন। এমন বাচ্চাদের কাছে, যারা জীবনে কখনও পুজোর জামা বলে কিছু পায়নি। সেইসব মানুষরা আমার দেওয়া সামান্য নিবেদনে ওই বাচ্চাদের জামা পৌঁছে দেবেন বলেছেন। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

যাই হোক, বেড়ানোর পালা শেষ। এবার বাড়ির পথে। দুর্গাপুরে দুপুরের খাওয়া সেরে, বর্ধমানে মিহিদানা আর সীতাভোগ কিনে বাড়ি যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। কাল থেকে আবার দৈনন্দিন বেঁচে থাকবার লড়াই। এ' লড়াই চিরকালের। তবু তারই মধ্যে এমন সব ছোট ছোট ছুটির সন্ধান, বেঁচে থাকবার তাগিদেই।

Ananda Sen — Ananda is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abhro keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

বাসবী খাঁ ব্যানার্জী – জার্মানির লোয়ার স্যাক্সনী রাজ্যের ব্রানসউইক শহরের বাসিন্দা। জার্মান নাগরিক। পড়াশুনো কর্ম জীবনের শুরু কলকাতায়। পেশায় শিক্ষাবিদ, অধ্যাপিকা ও লেখিকা। লেখার শুরু স্কুল ম্যাগাজিনে। পরবর্তী সময়ে আনন্দবাজার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, এশিয়ান এজ, কালান্তর, নানা পত্রিকায়। মাঝে ৩০ বছর বাংলায় লেখা হয় নি। ২০১৮তে আবার নানা পত্রিকায়, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ই-ব্লগে বাংলায় লেখা শুরু। মানুষের সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন ও ছিন্নমূল মানুষের কথা লিখি।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন সাতটি শহরে এবং সতেরোটি বাড়িতে বিছিয়ে দেওয়া নিজের চল্লিশোর্ধ জীবনে অনেক গোল, চৌকো, সোজা এবং তেরচা গল্প জমে গেছে। অতএব লেখা শুরু হয়েছিল আট দশ বছর আগে। মুশকিল হল লিখতে গিয়ে আরও বেশি বেশি গল্প খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই লেখা চলছে জোরকদমে। সেইসব গল্পের কিছু নোঙ্গর বেঁধেছে 'যেবার পেলে এসেছিল' এবং 'বাবালি বাবালি বাবালি' গল্পগ্রন্থে। প্রথম উপন্যাস ছায়াপাখি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের মুখে। কিছু নাটকও লিখেছেন। দুটি অনূদিত নাটক রনাঙ্গন এবং ঘুঘুডাঙ্গা মঞ্চে প্রশংসিত। তার এখনকার শহর অ্যান আরবার, মিশিগান কিন্তু চেন্নাই এবং কলকাতায় টিকি বাঁধা আছে।

ধীমান চক্রবর্তী — জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা। বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী — প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও। পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক। কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা।

ইন্দিরা চন্দ — মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

মানস ঘোষ — মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক''। এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার দুটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

মিতালি রায় (শুভাপ্রিয়া) – জন্ম উত্তর কলকাতার বিখ্যাত সিমলা পাড়ায়, ৯ই অক্টোবর। সাহিত্য নিয়েই বরাবর পড়াশুনা। সাহিত্য জগতে প্রবেশ ১৯৯৭ সালে "সাহিত্য রূপা" পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – "ডায়েরির পাতা থেকে", "অন্য প্রেম", "নদী ও অন্যতিন" ইত্যাদি। বিভিন্ন কাব্যসংকলন এবং গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়ে চলেছে নানা কবিতা, গল্প। সম্পাদিত পত্রিকা – "শরণ্যা"

নন্দিনী ব্যানার্জী – সিডনি নিবাসী। পেশায় একজন এনালিস্ট (Environmental / Geographical Information System), নিউ সাউথ ওয়েলস গভর্নমেন্ট চাকুরীরতা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে পি.এইচ.ডি. করা নন্দিনীর ভালোবাসা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে জন্মায় বাংলা লেখার নেশা। "সিডনি বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়ালেস (BANSW)" – প্রবাসী পত্রিকা, কলকাতার কিছু কিছু অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দিক থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার আস্থা মনে নিয়ে নন্দিনীর এগিয়ে চলা।

Partha Pratim Ghosh – As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsyl-vania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

রমা জোয়ারদার — দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

সমাদৃত চক্রবর্তী – দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ার চাপ ও খেলাধুলার ফাঁকে মাঝে মাঝে তুলে নেয় কলম, লিখে ফেলে ছোটো ছোটো নাটক আর গল্প। নাটক পরিচালনাতেও তার ঝোঁক যথেষ্ট। বন্ধুদের জুটিয়ে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বরচিত নাটক প্রায়ই নির্দেশনা দিয়ে ফেলে সে। হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী সমাদৃত এই প্রথম কলম ধরলো এই পত্রিকার জন্য।

শঙ্খ ভৌমিক – পেশায় অধ্যাপক; নেশায় নাট্যছাত্র ও সাহিত্যপ্রেমী। অভিবাসী জীবনের টুকরো যাপন নিয়ে কখনো নাটক, কখনো ছোট গল্প লেখা।

শ্রাবনী রায় আকিলা – পড়তে, লিখতে, বলতে, শুনতে, জানতে, দেখতে, ভাবতে ভালোবাসেন। এখনও পর্যন্ত্য লিখেছেন আনন্দবাজার, এই সময়, দুকূল, বর্তমান এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। নিজের একটি ব্লগও আছে। তবে সবথেকে বেশি স্বস্তি বোধ করেন নিজের ফেসবুক ওয়ালে নিয়মিত, স্বাধীন ও ইচ্ছামত লিখতে।

অভিবাসী লেখক **শ্যামল দাশগুপ্তের** জন্ম, বেড়ে ওঠা শহর কলকাতায়। শিবপুর বি ই কলেজের স্নাতক, আই. আই. টি খড়গপুরের স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে চাকরিসূত্রে বসবাস করেছেন কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বহু শহরে। চাকরির সাথে সাথে যুক্ত ছিলেন কাজ করেছেন বহু সমাজসেবামুলক প্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীকালে জীবিকার প্রয়োজনে পাড়ি দেন সিঙ্গাপুরে এবং অবশেষে উত্তর আমেরিকায়। সাহিত্য, রাজনীতি, বাংলার প্রাচীন ইতিহাস এগুলি লেখকের প্রিয় বিষয়। নিবিড় যোগাযোগ আছে দেশের সাথে, মূলতঃ দেশজ উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেন।

স্নিগ্ধা সেন পারিবারিক সূত্রে ওপার বাংলার হলেও আজন্ম কলকাতারই বাসিন্দা। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, প্রথমে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিউশনে, এবং পরে একাধিক ওপেন ইউনিভার্সিটিতে। সাহিত্য চর্চার শখ বহুদিনের। এই আশী উত্তর বয়সেও সে চর্চা চলছে পূর্ণ উদ্যমে। কলকাতার অনেক পত্র পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে – গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটি বই – "হ্যামলেট" এবং "ওদের কি খেতে দেবে"।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় – উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার শেষে কিছুদিনের শিক্ষকতা-জীবন। তারপরেই প্রবাসে পাড়ি। গত বাইশ বছর যাবৎ ঠিকানা নিউ জার্সি। পেশায় মন্তেসরি শিক্ষিকা। ২০০৮ সাল থেকে ছদ্মনামে ব্লগলেখা শুরু। ২০১০ থেকে বিভিন্ন দেশ ও বিদেশের পত্রপত্রিকা ও শারদীয়াতে নিজের নামে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা চলতে থাকে, কমিউনিটির বিভিন্ন ভলেন্টারি কাজের পাশাপাশি নাটক ও সঞ্চালনা করে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন। **Batayan Incorporated** থেকে সদ্য প্রকাশিত ''এক বাক্স চকলেট'' গল্পের বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী**। পার্থিব বাসিন্দা। ৯টা-৫টার চাকর। পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের

আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

উদয় মুখার্জী – পন্ডিচেরী নিবাসী, আদ্যন্ত ভ্রমণ বিলাসী, সরকরী চাকরি শেষে বর্তমানের অখন্ড অবসরে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা'কে নিজের মতো করে লেখায় ধরে রাখতে ভালোবাসেন, লেখার পাশাপাশি রান্নাতেও পারদর্শী, দেশ বিদেশের রেসিপি'তে সিদ্ধহস্ত, আর ভালোবাসেন হই হই করে আড্ডা দিতে।

ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় – নিজের ব্যাপারে লেখার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে আর বুড়োবেলা কাটছে বিদেশের মাটিতে। কথায় কথায় বেলা বয়ে সামাজিক জটলায় নিজেকে বেশ আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেলেছি। এখন অবসরের অছিলায় 'আমি' নামক বস্তুটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এক
বাক্স
চকলেট
সুজয় দত্ত